উপন্যাস সিরিজের নবম সংখ্যা

সীতার ভাগ্য।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

মূল্য ১৲ টাকা

উপহার
তারিখ ——————— ।
শ্রী ———————

সুহৃদ্‌বর,

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী এম্‌-এ,

করকমলেষু
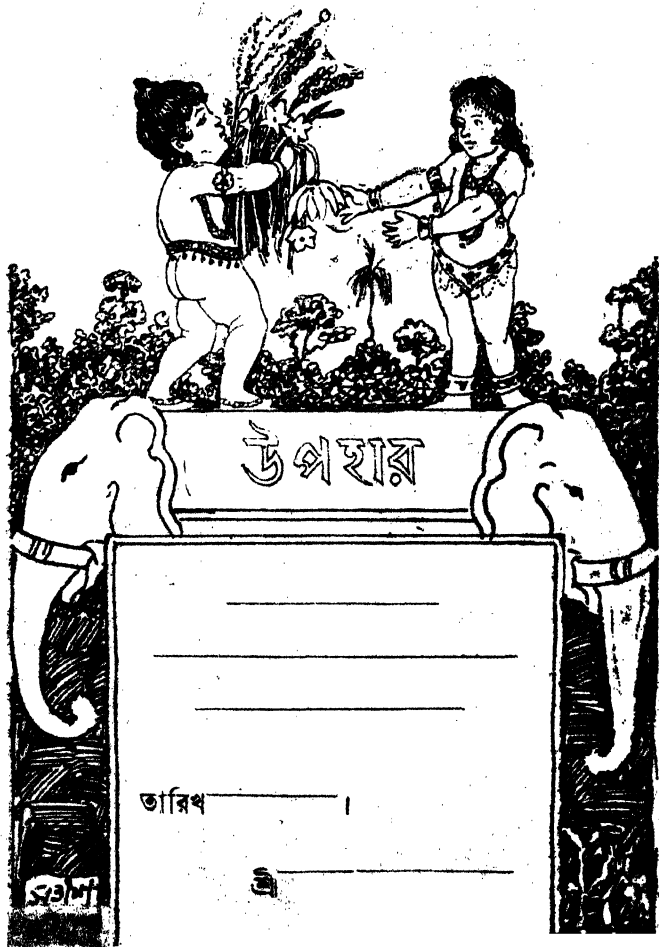
সীতার ভাগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-দর্শন।
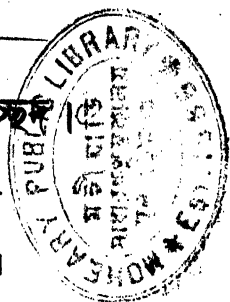
সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। বাড়ীর পাশের রাস্তায় ময়লা গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দে কনকের ঘুমটি ভাঙ্গিয়া গেল। শীতকাল, কনক লেপটি বেশী করিয়া টানিয়া চক্ষু চাহিতেই দেখিল, সীতা মুখখানি বসনাবৃত করিয়া বসিয়া আছে।

কনককান্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল—এরই মধ্যে যে?

সীতা বলিল—এরই মধ্যে কি আবার!

বলি, এত সকালে উঠেছ যে?

কেন, আমি কি রোজ বেলায় উঠি নাকি! ওঃ, কী আমার সকালে উঠিয়ে গো!

কনক মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—তবে এক কাজ করে ফেল চট্ করে! ছাদে গিয়ে সূর্য্যোদয়টা দেখে এস।

সীতা বলিল—কেন তা'তে কি হবে ?

কনক বলিল—একটা দেখবার জিনিষ। ভাগ্যে ত ঘটেনি কখনও—আজ যখন এখনি উঠেছ—

আমি কি এখন উঠেছি ? ক—খোন উঠেছি।

শীঘ্র যাও, নইলে আর হ'বে না।

আর ঠাট্টা করতে হ'বে না। আমি যেন কখনও সূর্য্যোদয় দেখিনি !

দেখেছ ? সত্যি বলনা, দেখেছ ?

সীতা চুপ করিয়া রহিল।

কনক বলিল—আচ্ছা বল দেখি—কোন্ দিকে সূর্য্য ওঠে—এই দিকে না এই দিকে ?—বলিয়া সে উত্তর এবং পরে দক্ষিণদিকে হস্ত প্রসারিত করিল। সীতা একটু ভাবিয়া দক্ষিণ দিকটিই দেখাইয়া বলিল—ঐ দিকে !

কনক হাসিয়া উঠিল—বলিল—বা বা ! খুব দেখেছ ত মোশাই ! এটা হ'ল কোন্‌দিক ? দক্ষিণ—

সীতা বলিয়া উঠিল—এইদিকে ! এইদিকে ! ঐ দেখ, জানালা দিয়ে রৌদ্রের রেখা দেখা যাচ্ছে।

তা—ইত—বলিয়া কনক লেপটি মাথা অবধি টানিয়া দিল। অনেকক্ষণ বাদে যখন মুখ খুলিল, দেখিল, সীতা তেমনি ভাবে বসিয়া আছে। মুখখানি বড় ম্লান। কনক লেপের মধ্য হইতে তাহার হাত দুটী টানিয়া লইয়া বলিল—এত বিমর্ষ কেন সীতা ?

সীতা নীরব। কনক হাত দু'টি ছাড়িয়া দিয়া তাহার গলাবেষ্টন করিয়া মুখখানি মুখের কাছে নত করিয়া বলিল—রাগ হ'ল ঠাট্টা করেছি

ব'লে! ছিঃ—একবিন্দু উষ্ণ অশ্রু নিমীলিত চক্ষের পাতায় পড়িতেই কনক ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। সীতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—ওকি সীতা—কাঁদছ?

সীতা কাঁদিয়া ফেলিল। এতক্ষণ অশ্রু তাহার ভিতরে বর্ষার মেঘের মত জমাট বাঁধিয়াছিল, কনকের সস্নেহ সম্ভাষণে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বর্ষণ-মুখর মুখখানি ভাসিয়া গেল।

কনক বলিল—কি হয়েছে সীতা?

সীতা অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল—বে'র সময় সকলেই ত নামটা বদলাতে বলেছিল, তুমি কেন রাজী হ'লে না!

কনক এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—সীতা নামে দোষ কি?

কি দোষ সীতা মনে জানিলেও মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল—মন্দভাগিনী জনক-নন্দিনীর ইতিহাস কি কনক জানে না! একমিনিট পরে বলিল—আমি কাল এক স্বপ্ন দেখেছি।

কি স্বপ্ন?

কুস্বপ্ন বলতে নেই যে!

আমি বলছি—বল।

সীতা বলিল—স্বপ্ন দেখ্‌লুম, আমি যেন বনবাসে যাচ্ছি—

কনক হাসিল। হাসিয়া সীতার দক্ষিণ হস্তটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বনবাস যাচ্ছ? সঙ্গে কে আছে? লক্ষণ! লক্ষণ কে হ'ল?

সীতা বলিল—তুমি হাসছ?

হাসবার কথা, হাসব না! এরই জন্যে এত কান্না! আমি বলি কি-না কি-হ'য়েছে।

সীতার ভাগ্য

সীতা বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—একি কম হল ?

কনককান্তি বলিল—না, না খুব বেশী হল ! একেবারে গাঁজাখুরী !

সীতা বলিল—স্বপ্ন কি সত্য হয় না ?

কনক বলিল—আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম কি জান ? সে অনেক দিন আগে। স্বপ্ন দেখলুম, যেন এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—আর আমি সব দেশের রাজা হয়েছি।—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সীতা বলিল—কিন্তু আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। একবার হয়েছিল।

কনক সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—বল কি সীতা !

সীতা বলিল—সত্যি !

কি রকম শুনি।

শুনলে তুমি ঠাট্টা করবে। সে আমি বলব না।

না বলেই বুঝলে যে—আমি ঠাট্টা করব। তোমার কি সূক্ষ্মদৃষ্টি !

সকল কথাতেই তোমার ঠাট্টা।

আচ্ছা আমি এই গম্ভীর হ'লুম ! কি রকম গম্ভীর জান ! একেবারে সমুদ্রের মত। সমুদ্র দেখেছ ত ?

সীতা বলিল—দেখেছি বৈকি ! সেই যে বে'র পরই তুমি পুরী গেছলে। তুমি দেখলেই আমার দেখা হ'য়ে গেল।

কনক বলিল—ঠিক বলেছ—আমি দেখলেই তোমারও দেখা হয়ে গেল। রবি বাবুর কেতাবেই ছাপা রয়েছে—

"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"—

এখন, সে স্বপ্নটা কি—যেটা সত্য হয়েছিল ?

সীতা বলিল—বেলা হয়ে গেল, আমি উঠি।

কনক বলিল—ওঠো-না, আমিত বারণ করছি নে। আমি কিন্তু না শুনে উঠব না—

অন্য সময় বলবথ'ন।

আমিও অন্য সময় উঠবথন।

সীতা বলিল—আচ্ছা লোক যাহোক। যা ধরবেন—তাই-ই।

কনক বলিল—তুমিও আচ্ছা লোক।

ওঠো বলছি—হ্যাঁ যাও,—

যাবনা ত!—আধখানা বলে থেমে গেলে কি হয় জান? মাথা ধরে!

সীতা বলিল—ওঃ—কি আমার ডাক্তার গো। বলি ডাক্তার বাবু, শোন তবে। বে'র আগে তুমি গেছলে না আমাকে দেখ্‌তে! পাঁচ ছ' জন গেছলে ত? কেউ ত জান্ত না যে তুমিই! কেউ জান্ত কি?

না।

সেই রাত্রেই আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলুম। সেই পাঁচ ছ'জনের মধ্যে কেবল তোমাকেই দেখেছিলুম।

বল কি!

সত্যি! দেখেছিলুম যে—

চুপ করলে যে! বল, বল। ভারি জমে যাচ্চে।

যে,—তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ, সত্যি হ'ল না?

কনক সস্নেহে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—সত্যি সত্যি সত্যি—একেবারে তিন সত্যি।

নিমেষের জন্য সীতার মুখখানি হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মেঘাবৃত শশীর মত ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল—দেখ, কত বড় বড় জায়গা থেকে

আমার সম্বন্ধ আস্‌ছিল। কোথাকার এক বড় রাজার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল——আমি তোমাকেই স্বপ্ন দেখেছিলুম, তোমাকেই পেয়েছি!

দুঃখ হচ্ছে নাকি! কোথায় রাণী হ'তে তা না হ'য়ে—

তা নয়। আমি ত রাণীই! তোমার রাণী। তুমি আমার রাজা!

যা'কে কেতাবের ভাষায় বলে—'হৃদয়রাজ্যের রাণী'—কি বল সীতা!

সে সব জানিনে আমি। কোথাকার রাজা কেমন রাজা জানবার দরকার নেই—শুধু এই জানি—তুমি আমার রাজা! কিন্তু এই স্বপ্নটা?

কনক তাহার রক্তকোমল আঙুলগুলি টানিতে টানিতে কহিল—সব স্বপ্ন সত্য হয়না সীতা। প্রথমটা যে সত্য হ'য়েছিল, সে স্বপ্ন বলে নয়, তুমি হয়ত অতলোকের মধ্যে থেকে আমাকেই পসন্দ করেছিলে......

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সীতা লজ্জানতমুখে বলিল—তা করেছিলুম।

কনক বলিল—তাই সত্য হ'য়েছিল। কাল যে স্বপ্ন দেখেছ' তা ত আর তুমি প্রার্থনা কর না? না, না—তাই বল্‌ছি—আমি কি তোমাকে জানিনে? এখনও একবছর হয় নি, তবু আমাদের কি রকম ভাব হ'য়েছে সীতা? আচ্ছা—সকলেরই কি এই রকম হয়?

কি জানি—বলিয়া সীতা উঠিয়া পড়িল।

কনক জামাটি গায়ে দিয়া নীচে নামিয়া যাইতেই, সৌরভী বলিল—বৌদি, মা বক্‌ছে—এত দেরী হল কেন উঠ্‌তে?

একমুহূর্ত্তে কল্পনা রাজ্যের রংচং সব কোথায় অন্তর্হিত হইল। সীতা দ্বারপার্শে দণ্ডায়মান ভৃত্যকে ঘর পরিস্কার করিতে বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—–—*—–—

সংসার।

সীতা নীচে নামিয়া দেখিল, বারান্দায় বড় টেবিলে বসিয়া কনক চা পান করিতেছে। অন্যদিন সে-ই চা প্রস্তুত করিয়া ঢালিয়া দিত এবং শেষে নিজেও এক পেয়ালা ঢালিয়া লইত। তাহার শ্বশ্রূ বারান্দার অপর প্রান্তে বসিয়া পাচককে রন্ধনের উপদেশ দিতেছিলেন। সীতা তাঁহার নিকট যাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—চা খেয়েছ?

সীতা নতমুখে না বলিল।

শ্বশ্রূ বলিলেন—কেট্‌লিতে তৈরী আছে, ঢেলে খাওগে।—ঠাকুর, খুব চট্‌পট্‌ করে নেবে বুঝ্‌লে? বাবু আজ একবার হুগলী আসবেন—সাড়ে দশটার গাড়ী। গল্প করতে বসে যেওনা যেন।

সীতাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—যাও না বাছা। চা-টা ঠাণ্ডা করছ কেন! খাবেই যদি গরম গরম খাও। না খাও—কথাই নেই—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—না খেলেই ত পার মা। ও কি ছাই এতই ভাল জিনিষ যে দু'টি বেলা না খেলে আর চলে না। আর ঐ সব ছাই পাঁশের জন্যেই ত আজকালকার ছেলেপিলে আধমরা জন্মায়, অন্ততঃ—এ-ক'টা মাস আর নাই খেলে!

সীতার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

শ্বশ্রূ কহিলেন—দু' পাঁচবছর যে হেসে খেলে বেড়াবে—সে বরাত ত নয়—এখন থেকেই বিধি-নিয়ম মান্‌তে হ'বে।

সীতা শীতের প্রভাতেও ঘামিতে লাগিল।

যাও বাছা, মুখভার দেখতে আর ভাল লাগে না। চা'টা খেয়ে কনকের কাপড় চোপড় একস্যুট বের করে মধুকে কুঁচোতে দাও—সে আবার হুগলী আসবে।—ওরে কনক, একবার শুনে যাস্‌ত।

কনক আসিতেই সীতা সরিয়া গেল।

তাহার মাতা বলিলেন—আমি বলছিলুম কি, জাহ্নবীরা খবর পাঠিয়েছে, গঙ্গাস্নান করতে যাবে—আমাকেও যেতে বলেছে। পাঁচবছর পরে দেখা শুনা কিনা—স্বামীকে নিয়ে যে-কী করবে ভেবেই পাচ্ছে না।

কনক বলিল—বেশ ত!

বেশ ত নয়। তুই আবার আসবি গিয়ে তোর খাওয়া দাওয়া—

সে হ'য়ে যাবে মা! তুমি যেও। জাহ্নবী তোমাকে নিয়ে যাবে, না গাড়ী জুততে বলে দেব?

মা বলিলেন—সে তুলে নিয়ে যাবে। আগে বলেছিল, কনকের গাড়ী পাওয়া গেলে ভালোই হয়। তা আমি বল্লুম, কনক হুগলী যাবে—

আমি ত আর বরাবর গাড়ীতে যাব না। ট্রামে গেলেও চলতে পারবে।

সে আর দরকার নেই। আমি বলে পাঠিয়েছি, সে গাড়ী করেই আসবে। আজকে উত্তরায়ণের দিন কি না ভাড়া একটু বেশী নেবে।

আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।—বলিয়া কনক প্রস্থানোদ্যত হইল। মাতা বলিলেন—হ্যাঁ, দেখ্‌, কনক, বৌমাকে বলিস না বাছা, ও ছাই চা-টা আর না খেলেই হয়।

কনক সহাস্যে কহিল—চায়ের অপরাধ ?

অপরাধ অনেক। ডাক্তার মানুষ এটা জানিসনে! বলিস—বুঝলি। ওর যদি খেয়ে তৃপ্তি হয় আমাদের বাধা দেওয়াটা কি উচিৎ ?—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কনকের জননী নীরবে বসিয়া রহিলেন। কনক দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে অনুচ্চস্বরে বলিলেন—সেই কনক!

উমাসুন্দরী সুগৃহিণী। কোন দিনই তিনি বেশী কথা বলিতেন না। আজও কিছু বলিলেন না।

উমাসুন্দরীর এই একমাত্র পুত্র। ছয় বৎসর কনকের পিতা কামাখ্যানাথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তদবধি উমাসুন্দরী দৃঢ়হস্তে বিষয় আসয় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

শুধু তাই নয়,—এককালে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে উমাসুন্দরীর অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। তাঁহার চারিখানি উপন্যাস (নাম প্রকাশ করা অনাবশ্যক) বাংলাদেশে পড়ে নাই এমন পাঠক কয়জন আছে? ছয় বৎসর উমাসুন্দরী আর সাহিত্যচর্চ্চা করেন নাই, এবং তাঁহার প্রকাশককে বলিয়া দিয়াছেন—পুস্তকগুলির আর সংস্করণ হইবে না। প্রকাশক বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু উমাসুন্দরীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন। ইহাতে উমাসুন্দরীর বেদনাও বড় অল্প হয় নাই। কিন্তু বেদনা যত বড়ই হউক না কেন চিত্তের দৃঢ়তা উমাসুন্দরীর আদৌ অল্প ছিল না।

বেহাই বাড়ীতে কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। বৌভাতের রাত্রে মেয়েরা ধরিয়াছিলেন—বেহান! আপনার বহি দিতে হ'বে।

উমাসুন্দরী সজলনেত্রে বলিয়াছিলেন—সে সব পুড়িয়ে দিয়েছি বেহান।

পাঠক-পাঠিকা সমাজ-ও যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহা নহে। কোন কোন কল্পনাকুশলা পাঠিকা বলিয়াছিলেন—সে ভালই। বহি লিখ্‌তে নানান কথা ভাবতে হয়—বিধবা মানুষের পক্ষে সে'টা ঠিক নয়।

নয়টা বাজিতেই জাহ্নবী, তাহার শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতি সকলে আসিয়া পড়িলেন। জাহ্নবী কনকের পিষিমার মেয়ে—কনকের বয়সী হইবে, তাহার স্বামী হাবড়ার রেলে কণ্ট্রাক্টরী কর্ম্ম করেন—কারবার মোটা এবং লাভও অল্প নয়।

জাহ্নবী প্রণাম করিতেই উমাসুন্দরী বলিলেন—তুই মা খুব মেয়ে। আজ যে উত্তরায়ণ আমার ত মনেই ছিল না—ভাগ্যে তোর লোক এল, নইলে ত ফস্কে গেছল।

জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী বলিলেন—আর বলো না দিদি। ঐ একরত্তি মেয়ে—তিথ্যি ধর্ম্ম ছাড়া আর ওর কথা নেই। আজ কোথায় কি সব খবর রাখে ও।

জাহ্নবী শ্বশ্রূর প্রশংসায় পুলকিত হইয়া উঠিল, বলিল—মামীমার কেবল সংসার আর সংসার।

তাহার শ্বাশুড়ী বলিলেন—কোলে পিঠে যদি তোরও দু'পাঁচটা হ'ত বাছা, দেখ্‌তুম—কি কর্‌তিস্‌ তুই। বিধাতা ত সব সুখ দেন না দিদি—আমার বরাত মন্দ।—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা রমণীর কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

উমাসুন্দরী মনের মধ্যে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—ছেলে মানুষ, ঝাড়া হাত পা বেশ আছে, দিদি।

জাহ্নবী বলিল—চল মামীমা। আর দেরী কর না। তোমার বৌমা কৈ?

উমাসুন্দরী বলিলেন—উপরে আছে। তোরা একটু দাঁড়া বাছা, আমি আস্‌ছি।

উপরে আসিয়া দেখিলেন, আলমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা কি গুঁড়া দিয়া, সীতা কনকের সোনার বোতাম সাফ করিতেছে। উমাসুন্দরী রিঙে বাঁধা কয়েকটি চাবি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ভঁাড়ারের চাবিটে রাখ।

সীতা বলিল—ঠাকুরঝি এসেছেন মা?

এসেছেন—বলিয়া উমাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন। সীতা আলমারিটা বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া দেখিল, কেহ কোথায় নাই। গাড়ীখানা ফটক পার হইতেছে—বুঝিতে পারিল। এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

কনক স্নান সারিয়া বলিল—ভাত দিতে বল গো। সাড়ে ন'টা বাজে, আর অমনি মধুকে বলে দাও—আস্তাবলে খবর দিক্। কৈ আমার গরম গেঞ্জিটা?

সীতা গেঞ্জিটি চেয়ারের উপর রাখিয়া বলিল—জাহ্নবী ঠাকুরঝি এসেছিলেন।

কনক চুল অঁাচড়াইতে অঁাচড়াইতে বলিল—কি বল্লে?

দেখা হয় নি—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ভাত দেওয়া হ'য়েছে।

কনক জিজ্ঞাসিল—জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা হয় নি?

সীতা বলিল—না। উপরে ছিলুম।

যেতে হয়—বলিয়া কনক আহার করিতে গেল।

সীতা খাটের বাজুতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল—ঠাকুরঝি ত আমার সঙ্গে দেখা না করে যায় না। নিশ্চয়ই মা তাড়া করে নিয়ে গেছেন।

জাহ্নবীর স্নেহ-উচ্ছ্বল হৃদয়টির পরিচয়—সে যে দিন এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছে সেই দিন হইতেই পাইয়াছে। এমন কোন দিনই ছিল না যেদিন জাহ্নবী আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া না গিয়াছে।

চিরপ্রথামত সীতা বারান্দার চিকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল—কনক গাড়ীতে উঠিবার সময় অভ্যাস বশে সেদিকে চাহিতেই—চিকের ভিতর হইতেই কালো চোখের দু'টি তারা যেন করুণ হইয়া তাহাকে বিদায় বারতা জ্ঞাপন করিল, তার পর গাড়ীর ভিতরে বসিতেই গাড়ী ছুটিয়া গেল। সীতা নড়িল না, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সংসারে কোন দিনই তাহাকে কোন কাজ করিতে হইত না—কনকের ফাই-ফরমাজ ছাড়া তাহার করণীয় কিছুই ছিল না। সে যে ইচ্ছা করিয়াই সংসারের কাজ দূরে রাখিত, তা নয়। তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কোন কাজেই হাত দিতে দিতেন না—আর এমনই বা কি কাজ! ঐ ত একটি মাত্র লোক কনক—তাহার পিছনে ঝি চাকরের অভাব নাই।

সীতা অনেক সময় ভাবিত, যদি কনক খুব সৌখীন হইত, সে নানা কাজ পাইত; সে ত তাহা নয়, অত্যন্ত সাধাসিধা মানুষ। অন্ততঃ সে যদি একটু হেলাগোছাও হইত—তাহার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি গুছাইয়াও সে কতকটা সময় কাটাইতে পারিত—তাহাও নয়—কনক নিজের দ্রব্যাদি নিজেই ঠিক রাখিত এবং প্রয়োজনের সময় কাহারো সাহায্য না লইয়াই পাইত।

প্রথম-প্রথম, কনকের জামা, রুমালের কোণে নাম লিখিয়া, কাপড়ে ফুল তুলিয়া সে অনেক কাজ পাইত। ক্রমশঃ দেখা গেল, দোকান হইতে জামা কাপড় রুমাল আসে—সবই কনকের নাম লেখা! ফুল তোলা।

কনক পান খায় না যে সে বসিয়া বসিয়া মনের মত করিয়া পানই সাজিবে!

সীতা প্রায়ই ভাবে—কেন কনক এমন হইল? কনককে কতদিন সে অভিযোগ জানাইয়াছে, একে ত কনক অল্পভাষী, সদুত্তর পায় নাই। অধিকন্তু কনক মা'কে বলিয়াছিল—মা সীতাকে কাজকর্ম্ম করতে দাও না কেন?

মা বলিয়াছিলেন—না বাছা, আজকাল বউকে খাটান উঠে গেছে। আমার 'মর্ম্মব্যথা' পড়েছিস্ ত?

কনকের ইচ্ছা ছিল বলে—সকলেই 'মর্ম্মব্যথা'র সরসী নয়—যে সংসারে কাজ করিতে হইত বলিয়া আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু বলা হয় নাই। মা'র দৃঢ়তা সে জানিত, ফল ত হইবেই না, তবে কেন মা'কে বিরক্ত করা!

সীতাও সব শুনিয়াছিল, তদবধি সেও কনককে কিছু বলিত না।

এগারোটার সময় শ্বশ্রূ স্নান সারিয়া ফিরিলেন। সীতা নীচে নামিয়া গেল। শ্বশ্রূ একা ছিলেন না, তাঁহার সঙ্গে জাহ্নবীও কলে পা ধুইতেছিল। সীতা তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল লইয়া শ্বশ্রূর পা ধুইতে গেল, উমাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—আমি কি এখনো তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বাছা!

সীতা ভাবিল—সে কেন আর একটু আগে নামে নাই!

তাহার বিরস মুখখানির দিকে চাহিয়া জাহ্নবী বলিল—বৌ, আমার পা'টা ধুইয়ে দেবে ভাই?

সীতা নিরুত্তরে তাহার পায়ে হাত দিতেই জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—ও-কি ভাই! ছাড় ছাড়, না'হলে আমিও তোমার পা ধুইয়ে দেব।—বলিয়া সে সীতাকে টানিয়া তুলিল।

উমাসুন্দরী বলিলেন—জাহ্নবী, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই মা, তুই আমার মালসাটা চড়িয়ে দে।

জাহ্নবী সীতার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আমি কেন খাটব মামীমা, তোমার বৌ দিক্ না।

উমাসুন্দরী বলিলেন—না, না—আজ যে আমার মদনগোপালের প্রসাদ আস্‌বে। পোড়া কপাল, সব ভুলেই মরি!

জাহ্নবী বুঝিল—তাঁহার স্মরণশক্তির অল্পতা কোন দিনই ঘটে নাই! মনে মনে হাসিয়া বলিল—আসুক তোমার প্রসাদ—সে আমরা দু'জনে খাব'খন। আমি তোমার মালসা চড়িয়ে দিচ্ছি। কেমন ভাই সীতা?

জাহ্নবী রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—তুমি ভাই বড় বোকা।

সীতা নীরবে চাহিয়া রহিল।

জাহ্নবী বলিল—তুমি জোর করে কাজকর্ম্ম কর না কেন?

সীতা কথা কহিল না।

জাহ্নবী বলিতে লাগিল—দেখ ভাই—আমার কথা জান ত সবই। তবু আমি এক মিনিট বসে থাকি নে! মাসের মধ্যে একদিন যদি দেখতে পাই—ঢের। সেবা করা ত দূরের কথা, কাছে যাবারও আমার যো নেই—তাই বলে' সংসার ত আছে! তাঁর মা, ভাই বোন্—এ সব ত আছে—তা'দের আমি না দেখলে কে দেখবে বল?

সীতা বলিল—ঠাকুরজামাই কি বাড়ী আসেন না?

জাহ্নবী বলিল—এক একদিন। উপরে আসেন না—বড় একটা। যা ভাবছ তুমি—তা নয়—চোরে কামারে দেখাসাক্ষাৎ নেই।

সীতা চুপ করিয়া রহিল।

জাহ্নবী বলিল—তুমি ত ভাই ভাগ্যবতী! কনক ত সীতাগত-প্রাণ! এ ত তোমারই সংসার—তুমি সব করবে—দেখবে, শুনবে—তবে না!

সীতা বলিতে গেল—ভাই আমি করতে যাই, মা—

জাহ্নবী বলিল—মা বারণ করেন, এই ত! আচ্ছা—ঠিক করে বল দিকিন্—বাপের বাড়ীতে তোমার মা ওরকম বারণ করলে শুনতে?

সীতা একটু ভাবিয়া বলিল—না।

তবে! তোমার শ্বাশুড়ী ভাবেন—আহা আমার কচি বৌ—কিন্তু তা'তে ত হ'বে না ভাই। আমাদের সুখ-দুঃখ সংসারের ভেতর দিয়েই সব। তুমি ভাই লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে আমি বুঝাব কি। বাঙ্গালীর মেয়ে বৌ হয়ে এসে যদি বৌ হয়েই থাকে—সংসারে সে কোনদিনই স্থান পায় না। আদর তুমি অনেক পেতে পার, কিন্তু আসল যা তা ত' পাবে না। আদর কি লোকে করে তোমাকে? তোমাকে নয়, সে করে, কনকের বৌকে!

সীতা বলিল—কিন্তু ভাই, আমাকে যে এঁরা একেবারে পুঁতুলের মত করে রেখে দেন।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল—তুমি তা থাকবে কেন? তুমি ত পুঁতুল নও—তুমি যে মানুষ! এই ধর আমাকে! আমাকে আমার সংসারের লোকে ভালবাসে! সে তোমার ঠাকুরজামায়ের বৌ বলে নয়—তাঁর সঙ্গে ত সম্পর্কই নেই জান! লোকে আমাকেই ভালবাসে। তোমাকে যে আদর করে, সে কনকের খাতিরে! ঠিক কি না!

সীতা ঘাড় নাড়িল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না কোন্‌টা বেশী গৌরবের।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবীর শিক্ষকতা।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর সীতা জাহ্নবীকে তাহার কক্ষে লইয়া বসাইল। উমাসুন্দরী নিজের ঘরে খাটের উপর শুইয়াছেন। দিবা নিদ্রা অভ্যাসটি তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাও বলিয়া থাকেন, কতটুকই বা ঘুম হয়! এখনই সহিস দানা লইতে আসিবে, ভৃত্য কনকের খাবার লইয়া আফিসে যাইবে-- সবইত একহাতেই করিতে হয়। একটু আলস্য আসে—বইত নয়!

জাহ্নবী সীতার চুল বাঁধিতে বসিয়া গেল। বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—নিজেই বাঁধ ত?

সীতা নতমুখে বলিল—নইলে কে বেঁধে দেবে?

জাহ্নবী বলিল—কেন—শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বস না?

সীতা বলিল—আগে আগে যেতুম। মা বলতেন—আমরা বাপু সেকেলে মানুষ, আজকালকার চুল বাঁধতে জানিনে—সেই অবধি……

ছেড়ে দিলে—যাওয়া ? হাবা মেয়ে ! বলতে পারলে না যে মা তুমি যা জান, তাই বেঁধে দাও।

সীতা বলিল—আমি ত নিজে বাঁধতে জানি, কেন ওঁ'কে বিরক্ত করব।

জাহ্নবী ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—ওসব ন্যাকামির কথা ছেড়ে দাও। মাথায় ফ্যাসান না হ'লে বুঝি কনকের পছন্দ হয় না ?

সীতা আরক্তমুখে বলিল—তাঁর পছন্দ অপছন্দ জানি নে।

জাহ্নবী একমুহূর্ত্ত পরে বলিল—এত বৈরাগ্য !

সীতা ভাবিল—বলে-বৈরাগ্য নয় ! তাঁহার পছন্দ অপছন্দের কথা এই এক বছরের মধ্যে সে জানিতে পারে নাই। কতদিন সে চুল না বাঁধিয়াই শয্যায় গিয়াছে কম আদর পায় নাই ; বাঁধিলেও বেশী আদর ছিল না। —এ কথা সে বলিতে পারিল না।

জাহ্নবী পুনরায় বলিল— কনক কি বলে ?

সীতা বলিল—কিছু বলেন না।

জাহ্নবী কি ভাবিতেছিল, জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক সেই রকমই আছে !

সীতা একবার ফিরিয়া তাহার পানে চাহিয়া মাথা নমিত করিল।

জাহ্নবী অনেকক্ষণ কিছু বলিল না। আপনমনে দুইহাতে কেশের গুচ্ছ বিনাইতে লাগিল।

এই সময়ে সহিস একতল হইতে ডাকিল - মায়িজী !

জাহ্নবী বলিল—কে ডাক্‌ছে ?

সীতা বলিল—সহিস দানা চাইতে এসেছে।

দেবে কে ?

মা।

কেন—তুমি দাও গে না।

সীতা জাহ্নবীর পানে চাহিয়া বলিল—চাবি ত নেই আমার কাছে।

জাহ্নবী বলিল—কোথায় থাকে চাবি?

সীতা বলিল—ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো থাকে। মা'ই দেন।

জাহ্নবী বলিল—যাও, চাবি নিয়ে নিজে দিয়ে এস।

সীতা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল। যখন ফিরিল, জাহ্নবী তাহার দিকে চাহিয়া প্রফুল্লস্বরে বলিল—বৌ, তোমার খোকা হ'বে।

সীতা লজ্জায় মুখখানি নীচু করিয়া তাহার সামনে বসিয়া পড়িল।

জাহ্নবী বলিল—দেখে নিয়ো! জাহ্নবী মিছে বল্‌ছে না।

একটু একটু করিয়া লজ্জা দূর হইয়া গেল, সীতা মৃদুস্বরে বলিল, কেমন করে' জানলে?

জাহ্নবী বলিল—তুমি খুব রোগা হ'য়ে গেছ দেখে।

সীতা বুঝিল না,— চুপ করিয়া রহিল। জাহ্নবী বলিল—তখন আমি কি করব জান? তোমার খোকাকে রোজ সকালে নিয়ে যাব, আর রাত্রে পাঠিয়ে দেব। দেবে ত?

সীতা হাসিয়া বলিল—রাত্রেই বা দেবে কেন?

জাহ্নবী বলিল—নইলে খোকার বাবা কি রক্ষে রাখবে!—কনক কখন আসবে?

বিকেলে গাড়ী পাঠাতে বলে গেছেন।

ওঃ—গাড়ী যাবে শেয়ালদা? আগে ভাই আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে বলো। বল, বলবে ত······?

সীতা জাহ্নবীর এ অধীরতার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না, বলিল—তুমি যে বল্লে রাত্রে যাবে।

জাহ্নবী কি ভাবিয়া বলিল—তখন মনে ছিল না, আমার দেওর আজ আবার সন্ধ্যার গাড়ীতে বিদেশে যাবে কি-না। সব যোগাড় জাগাড় করে দিতে হ'বে। গাড়ীর কথা কি মামীমাকে বলতে হ'বে,—না তুমিই ব্যবস্থা করবে?

সীতাকে নীরব দেখিয়া বলিল—মামীমাকে বলতে হ'বে! কেন—তোমার এটুকু হাতও নেই?

সীতা নিরুত্তর। জাহ্নবী তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল—চাকর-কে ডেকে বলে দাও আস্তাবলে বলে আসুক। ভাবছ কি—যাও।

সীতা নিম্নস্বরে কহিল—ভাই, তিনি এ সব পছন্দ করেন না।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসিল—কে পছন্দ করেন না? ওঃ-কনক! সে কি বলে?

তিনি নিজেই সব দরকার মা'কে বলেন।

আচ্ছা—মামীমাকে বলে আসছি—বলিয়া জাহ্নবী উঠিয়া পড়িল।

সীতা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বস ঠাকুরঝি, আমি আস্তাবলে খবর পাঠাচ্ছি।—সে বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া সীতা জাহ্নবীকে বলিল—এইবার আমি তোমার চুল বেঁধে দি।'

দাঁড়া ভাই, সিঁদুর দিয়ে দিই তোকে—বলিয়া সে চিরুণীর ধারে সিঁদুর লাগাইয়া সীতার সীমন্তে পরাইয়া দিল; বাম হস্তের লৌহবলয়ে সিঁদুর দিয়া বলিল—বৌ, এই সিঁদুর অক্ষয় হো'ক্।

সীতা নত মস্তকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, জাহ্নবী দু'হাতে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিল—দূর্!

তাহারা শুনিতে পাইল, উমাসুন্দরী বলিতেছেন—হ্যাঁরে মধু, গাড়ী গেল শেয়ালদা?

মধু বলিল—গাড়ী জুততে গেছে। আগে দিদিমণিকে পৌঁছে আসবে, এসে শেয়ালদা যাবে।

উমাসুন্দরী বলিল—কে বল্লে?

সীতা জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ঐ দেখ, ভাই।

জাহ্নবী বলিল—তা'র হ'য়েছে কি! তুমি কি চুরী করেছ যে এত ভয়?

উমাসুন্দরী ডাকিলেন—বৌমা!

সীতা আসিতেই বলিলেন—আমি ত এখনও আছি বাছা, একবার জিজ্ঞাসাও ত করতে পারতে!

সীতা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জাহ্নবী বলিল—আমিই ওকে বলেছি, মামী! মিছামিছি ভাড়া গাড়ী করে' যাব—তোমাদের গাড়ী ত যাচ্ছেই—আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

উমাসুন্দরী বলিলেন—কেন যাবে না! ঐ ত পথ, না-রে?

জাহ্নবী বলিল—হ্যাঁ।

উমাসুন্দরী মধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—মধু, সহিস ত দানা নিয়ে গেল না। সে কি নিত্যি-নতুন হয় নাকি!

মধু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জাহ্নবী দীপ্তনেত্রে সীতার পানে চাহিতেই সে বলিল—এসেছিল, আমি দিয়েছি।

এক মুহূর্ত্ত পরে উমাসুন্দরী বলিলেন—কতটা দিলে ?

সীতা ভয়চকিত স্বরে কহিল—আপনি যা দেন—সেই মাপেই দিয়েছি।

উমাসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না। জাহ্নবীও সীতাকে টানিয়া ঘরে আসিয়া বলিল—কি হল ? কেটে ফেল্লে তোমাকে বৌ !

সীতা বলিতে পারিল না যে সে নীরবতাকেই বেশী ভয় করে !

বিদায়কালে সে জাহ্নবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ঠাকুরঝি, তুমি আমার গুরু ! ভাই, আমি তোমাকে মেনে চল্‌ব—দায় তোমার !

বেশ ত !—বলিয়া জাহ্নবী সস্নেহে তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

সীতা বলিল—আবার কবে আস্‌বে ?

জাহ্নবী বলিল—সুবিধে করতে পারলেই আস্‌ব। কনককে রেখে তোদের গাড়ী দুপুরবেলা ফেরে ত ! সেই সময় আমার বাড়ী ঘুরে আস্‌তে বলে দিস্।—মামীমাকে বলে যাব না কি ?

সীতা বলিল—না।

রাত্রে সে কনককে এই কথা জানাইল। কনক জিজ্ঞাসিল—মা'কে বলেছ ?

সীতা বলিল—কি ?

জাহ্নবী আসতে চেয়েছে—

সে আর আমি বল্‌ব কি ! মা ত যাবার সময় তা'কে কত করে বলে দিলেন আস্‌তে !

তবে আমাকে বলা কেন ?

গাড়ী.........

মা'কে বলো।—বলিয়া কনক শুইয়া পড়িল।

সীতা একমুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরে বলিল—আমার কথা কি কথাই নয়!

কনক তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—কি বলছ সীতা!

সীতা রুদ্ধস্বরে বলিল—কিছু বলি নি।—ঝপ্ করিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিয়া সে'ও শয্যাপ্রান্তে শুইয়া পড়িল।

বহুদিনের বদ্ধ খাঁচার পাখী হঠাৎ খাঁচার একটা তার কাটা দেখিলে ক্রমাগত তার ভিতর দিয়া মাথা গলাইবার চেষ্টা করে—সীতাও তেমনি জাহ্নবীকে দেখিয়া, মনে মনে জাহ্নবীর স্বাধীনভাবটি কল্পনা করিয়া কেবলই এদিক ওদিক করিতে লাগিল।

আজ এই বদ্ধ বাতাস যেন তাহার পক্ষে বেশী ভারি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এতদিন ত সে কোন কথাই ভাবে নাই—আজ একি নূতন শিক্ষা তাহার হইয়াছে—সে যেন কিছুতেই বদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না। মনের উত্তেজনা ত বড় কম নয়—আজ আর সে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কনককে জাগাইয়া রাখিল না। এই দম্পতী যে কত রাত্রি অবধি আলো জ্বালিয়া গল্প করিত, কেবলমাত্র সামনের বাড়ীর আর এক দম্পতী তাহার সঠিক হিসাব রাখিত।

সব চেয়ে তাহার দুঃখ এই, যে কনক তখনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রম ক্লান্তি কিছুই আজ মনে পড়িল না,—কনক যে তাহার কথা একটুও ভাবিল না, এ ত কেবল মাত্র নিশ্চিন্ততা নয়, অবহেলা বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। যদিও বা মধ্যরাত্রে একটু ঘুম আসিল, ভোরের আগেই সেটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সীতা আলো

জ্বালিয়া দেখিল, কনক গাঢ় নিদ্রামগ্ন, সযত্নে তাহার বালিশটী ঠিক করিয়া দিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্নানঘরে ঢুকিয়া স্নান করিয়া যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দাস-দাসীরা গৃহকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে। উমাসুন্দরী বাহির হইয়াই বলিলেন—এত ঠাণ্ডায় কেন বৌমা!

সীতা অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর দিতে পারিল না।

এ কি! তুমি কি স্নান করেছ?

সীতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, করিয়াছে।

এত ভোরে কি স্নান করে! ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে।—বলিয়া উমাসুন্দরী নীচে নামিয়া গেলেন।

সকালে উঠিয়া তাঁহার কাজ ছিল—দাসীর দ্বারা সমস্ত বাড়ীখানি ধৌত করা। আজ দেখিলেন—সে সকল পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। মনে মনে সৌরভীর প্রতি তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

সৌরভী কিন্তু সন্তুষ্ট ছিল না, সে মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া বলিল—এত ভোরে কি জল ঘাঁটা যায় বাপু! তোমার বৌমার আবার সব বাড়াবাড়ি।

সীতা পিছনেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, উমাসুন্দরী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—তোমরা না পার, কাল থেকে আমরাই করব।

উমাসুন্দরী বলিলেন—সত্যি বাছা! কেন এত—

সীতা নতমুখেই বলিল—আজ যে সকাল সকাল বেরুবে।

কে? কনক! কৈ—আমাকে কিছু বলে নি ত! তাই ত, ও ঠাকুর! ওঠে নি? বেলা ৮টা বাজে, এখনও বাবুর ঘুম ভাঙ্গল না।

উড়িষ্যাবাসী অপ্রসন্নমুখে উঠিয়া আসিল। উমাসুন্দরী বলিলেন—তোমার বাপু, ঘুমটা দিনকের দিন বাড়ছে। কটা বেজেছে সে খবর রাখ?

সীতা বলিল—ঠাকুর যাও, স্নান করে এস—চট্ করে, দেরী কর না-যেন।

ঠাকুর চলিয়া গেল। উমাসুন্দরী রৌদ্রে তেলের বাটি লইয়া বসিলেন। সৌরভী বলিল—আস্‌ছি মা, জলটা তোমায় চড়িয়ে দিয়ে আসি।

উমাসুন্দরী শীতকালে গরমজলে স্নান করিতেন। সীতা সম্মুখে বসিতেই বলিলেন—তোমার স্নান হ'য়ে গেছে বল্লে না?

সীতা বলিল—আপনাকে মাখিয়ে দিই।

উমাসুন্দরী বলিলেন—না বাছা, সৌরভী আস্‌ছে। একদিন আর তোমার হাতে তেল মেখে কি কর্‌ব বল!

সীতার মুখে আসিল—একদিন কেন মা, রোজ কি দিতে পারি না!—আস্তে আস্তে বাটিটা সরাইয়া সে উঠিয়া পড়িল।—কথা বাহির হইল না।

উমাসুন্দরী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কনকের চা'টা—

মধু জল গরম কর্‌ছে—বলিয়া সীতা চলিয়া গেল।

চটি-জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে কনক নীচে নামিতেই মা জিজ্ঞাসিলেন—হ্যাঁরে,—বৌমা বল্লে তুই সকাল করে বেরুবি—কৈ আমাকে ত কিছু বলিস্ নি।

কনক এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল—হ্যাঁ,—এমন সকাল নয়—বলিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

উমাসুন্দরী এই উত্তরে আর যাহাই হউন, প্রসন্ন হ'ন নাই। সৌরভীকে বলিলেন—তোর আর হয় না বাছা। নে শীগ্‌গির—

সৌরভী বিস্মিত হইল। বড় লোকের মেজাজ সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট বিস্ময় বরাবরই ছিল। মুখখানা ভার করিয়া বলিল—তুমিই বল, গা ফাটে, হাত ফাটে—বেশী করে মাখিয়ে দিস্।

উমাসুন্দরী বলিলেন—তাই বলে আমি ত সাত ঘণ্টা লাগাতে বলি নে বাপু!

কনক চা খাইতে বসিয়া উঠিয়া পড়িল। মা বলিলেন—খেলি নে?

এ কি খাওয়া যায়! একেবারে নিমসিদ্ধ।—বলিয়া সে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়া ফেলিল।

প্রথমাবধিই—উমাসুন্দরী বিরক্ত হইয়াছিলেন, এখন জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন—বৌমা! কি করেছ বাছা! বলি না পার, বল্লেই ত হয়—আমি ত এখনও মরিনি। নে বাপু, তুই সর—সৌরভী সরিয়া গেল—ও কনক, কনক—আমি করে দিচ্ছি—আয়।

কনক বলিল—থাক্।

উমাসুন্দরী নীচে নামিয়া গেলেন। সিঁড়ির নীচে বসিয়া মধু চা খাইতেছিল—তাঁহাকে দেখিয়া ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল।

উমাসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন—ওকি রে, মধু?

মধু কানে কম শুনিত, সে পূর্ব্ব কথা কিছুই জানিত না। এক গাল হাসিয়া বলিল—একটু চা খাচ্ছিনু মা। তৈরী করনু কি না, ভাবনু একটু খেয়ে দেখি।

উমাসুন্দরী তপ্ত কটাহে কৈ মৎস্যের মত লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—তোকে চা করতে বল্লে কে মধু?

সীতা সহজ ভাবেই বলিল—আমিই বলেছি।

উমাসুন্দরী বলিলেন—তোমার সব তা'তেই এত গিন্নীপণা কেন বাপু ?

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আমি যতদিন আছি—ও সব আমি দেখতে পারব না। বৌ মানুষ—বৌ মানুষের মতই থাকবে। না পার—

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, সীতা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—পারব।

সে আর ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল না—সরিয়া গেল। উমাসুন্দরী এক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন—আমি মরি আগে—তারপর দশহাতে সংসার কর'। যতদিন আছি—আমাকেই গিন্নীর পদটা ছেড়ে দাও। না পার, কনককে বল,—আমাকে কোথাও পাঠিয়ে দিক্।

মধু এতক্ষণে বুঝিতে পারিল যে কোথাও একটা কিছু গোল হইয়াছে। সে চট্ করিয়া চা'শুদ্ধ বাটিটা ফেলিয়া পলায়নোদ্যোগ করিল। উমাসুন্দরী তাহা দেখিয়া বলিলেন—ফেলে যাচ্ছিস যে! খেয়ে যা, আর উপরের বারান্দায় বাবুর বাটিতে চা আছে—যা বৌমাকে দিয়ে আয়!

মধু অনেকদিনের চাকর। গৃহিণীর ধমক চমক তাহার গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বলিল—একটু মিষ্টি দিতে পার, মাঠান্!

উমাসুন্দরী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও সৌরভী, কোথায় গেলি—বাবুকে গোটাকত রসগোল্লা এনে দে রে!

ঠিক এই সময়ে সীতা কনকের ত্যক্ত চা ও মিষ্টান্নের থালা মধুর সামনে নামাইয়া দিয়া বলিল—বাবু ছোঁননি, মধু, খেয়ে ফেল্।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—–*—–

আবার জাহ্নবী।

কনকের ডাক্তারখানা ছিল। সে রোজ দশটার সময় সেখানে গিয়া বসে—সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। পিতার আমলের ডাক্তারখানা—প্রচুর লাভের ব্যবসা। অনেক লোকজন আছে।

সেদিন আফিসে পৌঁছিয়া কনক কোচম্যানকে বলিয়া দিল—গাড়ী জাহ্নবীর বাড়ী লইয়া যাইতে।

সীতা আর কিছুই বলে নাই—বাহির হইবার সময় দেখাই হয় নাই। তবু কনক বুঝিয়াছিল—সীতা জাহ্নবীকে চায়! তাই গাড়ী পাঠাইয়া দিল।

উমাসুন্দরী আহার করিতে বসিয়াছিলেন, জাহ্নবীকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে মা জাহ্নবী এলি? গাড়ীর ভাড়া কত? ও মধু!

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল—তোমাদের গাড়ীতেই ত এলুম, মামী। কাল যে বৌকে বলে গেছলুম!

উমাসুন্দরী আর কিছু বলিলেন না। জাহ্নবী কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বলিল—বৌ কোথা মামী?

যেখানে থাকে—বলিয়া উমাসুন্দরী আহারে মন দিলেন।

জাহ্নবী উঠিয়া পড়িল। উমাসুন্দরী বলিলেন—দু'টো পান সেজে দে ত জাহ্নবী!

জাহ্নবী হাত ধুইয়া বাটা খুলিয়া বলিল—এই যে মামী! পান সাজা রয়েছে।

উমাসুন্দরী বলিলেন—তাহ'লেই হ'য়েছে আর কি বাছা! ও পান খেলে কি আর রক্ষে আছে আমার!

জাহ্নবী বলিল—খেয়েই দেখ না-মামী।—বলিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল।

সীতা তাহাকে দেখিয়া বলিল—কেন দিয়ে এলে না সেজে?

খোদার ওপর খোদকারী কি চলে ভাই?—বলিয়া জাহ্নবী সীতাকে চাপিয়া ধরিল।

সীতা ম্লান মুখখানি তুলিয়া বলিল—দেখ্‌লে ভাই? আমার পান সাজাটি পর্য্যন্ত পসন্দ হয় না!

জাহ্নবী বলিল—আর কোনদিন দিয়েছিলে, না, এই প্রথম।

সীতা বিষণ্ণ মুখে বলিল—দেব কি! এতে কি দিতে ইচ্ছে করে?

বলি, এই প্রথম ত?

সীতা ঘাড় নাড়িল। জাহ্নবী বলিল—সেই জন্যই মামীর ভয় হচ্ছে—ভাবছেন বুঝি আনাড়ি! খেলে মত বদলাবে'খন।

আমার মাথা বদলাবে—বলিয়া সীতা খাটের উপর বসিয়া পড়িল। জাহ্নবী তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—গাড়ীর ব্যবস্থা কে করলে? তুমিই?

সীতা দুঃখিতভাবে বলিল—আমি! হ'য়েছে আর কি!

জাহ্নবী বলিল—মামীও ত জানেন না বলেই বোধ হ'ল। তবে কে—কনকই করেছে বোধ হয়। তুমি তা'কে বলেছিলে কিছু?

বলেছিলুম।

সে কি বল্লে ?

সীতা উত্তর দিল না। যে উত্তর সে পাইয়াছিল, সে কথা জাহ্নবীকেও বলিতে চাহে না!

জাহ্নবী পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সীতা বলিল—তিনি কিছুতেই কথা ক'ন না।

উমাসুন্দরী নীচে কাহাকে কি বলিতেছিলেন, সীতা জাহ্নবীর গা টিপিয়া দিয়া বলিল—শুন্‌ছ—হচ্ছে।

জাহ্নবী উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পরে বলিল—ও মধুকে কি বল্‌ছেন। তোমাকে নয়!

সীতার সন্দেহ ঘুচিল না। সে উমাসুন্দরীর কক্ষে বিছানাটি পাতিয়া আসিয়া বলিল—তুমি এখানেই থাকবে ?

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল – মানে ?

সীতাও হাসিল, বলিল—মা উপরে আস্‌ছেন—তাই বল্‌ছি।

আমি ত মার কাছে আসিনি—তোমার কাছে এসেছি। তা' চল, দু'জনেই তাঁর কাছে একটু বসিগে।

সীতার ইচ্ছা ছিল না। আগে সে দু'একদিন গিয়া বসিয়াছিল, উমাসুন্দরী বিরক্ত হইতেন বলিয়া আর যাইত না। আজ জাহ্নবীর কথা ঠেলিতে পারিল না।

তাহারা ঘরে ঢুকিতেই উমাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন—আমি কি রোজ এত বিছানা পেতে শুই!—বলিয়া স্বহস্তে সেগুলি উঠাইতে লাগিলেন।

জাহ্নবী বলিল—দাও না বৌ, ওগুলো তুলে। কি পেতে শোও মামী!—শুধু কম্বল ?

তা ছাড়া আবার কি মা !—বলিয়া উমাসুন্দরী বিলাতী কম্বলখানি পায়ে চাপা দিয়া বসিলেন।

জাহ্নবী বলিল—মামী, একটা গল্প বল। তোমার লেখা গল্প।

উমাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—সে সব কি এখনো মনে আছে জাহ্নবী !

জাহ্নবী বলিল—ওমা সে কি গো ! মনে নেই—তোমার নিজের লেখা।

উমাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তা কি থাকে রে ! কতকাল সে-সব চর্চ্চা নেই। সব ভুলে গেছি।

জাহ্নবী বলিল—নাই বা থাকল চর্চ্চা—তা' বলে ভুলে যাবে কি ! আমি কবে সেই রমার বে'তে একটা পদ্য লিখেছিলুম, সে ত' আমার ঠিক মনে আছে। একটি অক্ষরও ভুলিনি।

উমাসুন্দরী বলিলেন—তুই সেই একটা লিখিছিলি বোধ হয়—তাই তোর মনে আছে। আমার ত একটা আধটা নয়—কতই যে লিখিছি, কোন্‌টা মনে থাকবে ! সব মিশিয়ে—সত্যমিথ্যা একাকার—মেঘ আর গিরির মত—হ'য়ে গেছে।

সীতার পানে চাহিয়া জাহ্নবী বলিল—বৌ, মামীর "মুক্তির পথে" বই পড়েছ ?

সীতা ঘাড় নাড়িল—সে পড়ে নাই।

জাহ্নবী মামীকে বলিল—আচ্ছা মামী, ও বই তুমি প্রথম যখন লিখেছিলে, তোমার বয়স কত ?

উমাসুন্দরী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন—তখন—কত আর হ'বে—এই কুড়ি একুশ। আমার কনক তখন কোলে। তুই-ও আসিস্ নি তখন এ বাড়ীতে।

হ্যাঁ ঠিক মনে আছে, তার পরের ফুলদোলেই তোকে পেয়েছিলুম। পুরীর সমুদ্র থেকে। তার পরই আমি "কাম্যফল" লিখতে আরম্ভ করি, যার নায়িকা হলি তুই—পড়েছিস ত!

ঐটিই ত তোমার সব চেয়ে ভাল বই না-মামী?

কে জানে বাপু—কোন্‌টি ভাল! বিক্রী ত সবগুলিই হ'ত খুব। তবে—তোর মামা বল্‌তেন—ঐখানিই তাঁর লাগত ভাল।

জাহ্নবী বলিল—মামী, এখন আর তোমার লিখতে ইচ্ছে হয় না?

উমাসুন্দরী হাসিলেন, বলিলেন—না।—তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া চুপ করিলেন।

জাহ্নবী সীতার নত নেত্র দু'টির পানে চাহিয়া উমাসুন্দরীকে বলিলেন—মামী বৌকে আজ নিয়ে যাব আমি?

উমাসুন্দরী বলিলেন—তা-যা-না বাছা। ও আর আমার কি ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করে বল্‌।

জাহ্নবী চাহিতেই, সীতা বলিয়া উঠিল—আমি যেতে পারব না।

এসব তোমার কি হ'চ্ছে বৌমা! ও আদর করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে—আমি কথা দিলুম, আর তুমি বল্লে কি-না যাব না।

উমাসুন্দরী বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইতেই সীতা বলিল—আমি—যাব না বলিনি, যেতে পারব না বলেছি।

মানে ত একই। বাঙ্গালা কথার ব্যখ্যা আর আমার কাছে কর'না মা। কেন—যেতে পারবে না শুনি? তোমার নিজের ঠাকুরঝি নেই—জাহ্নবী আছে, আদর করে, আসে—তাই! ও যে আমার কি মেয়ে—ওর কদর তুমি বুঝবে কি? ছেলেবেলা থেকে কনক আমার···

জাহ্নবী প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে বলিল—আচ্ছা বৌ, তুমি জিজ্ঞেস করে' রেখ। না হয় আর একদিন যাবে—তার-আর-কি!

উমাসুন্দরী বলিলেন—তার আবার জিজ্ঞেস করাকরি কি রে জাহ্নবী! এইখান থেকে এইখানে যাবে—আমি যখন বল্‌ছি যেতে—আবার কা'কে জিজ্ঞেস করবে! কনককে ত তুই জানিস্—সে কি আমার তেমনি ছেলে!

জাহ্নবী বলিল—জানি।—কথাটা বলিয়া যেন থতমত খাইয়া গেল। সীতাকে বলিল—তোমার ইচ্ছে না থাকে—

সীতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ইচ্ছে আছে।

জাহ্নবী আর কিছু বলিল না। এই গোপনতার যে একটু কারণ আছে এবং যাহা উমাসুন্দরীর সাক্ষাতে বলিতে সীতা অনিচ্ছুক—সে তাহা বুঝিতে পারিল।

মধু বলিল—গাড়ী এসেছে, দিদিমণি যাবেন কি?

জাহ্নবী উঠিয়া পড়িল। আড়ালে আসিয়া সীতাকে বলিল—যাবে?

সীতা বলিল—আজ নয়—কাল যাব। সকালে যখন আফিস যাবেন—সেই সঙ্গে যাব।

জোড়ে—বলিয়া জাহ্নবী হাসিয়া, তাহার হাত দু'টি মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সীতা ভাবিল—সে যাইলেই ভাল করিত! কেন যে জাহ্নবীর প্রস্তাবে সে অমত করিয়াছে, নিজেই তাহার কারণ জানে না। প্রাণটা ত যাইবার জন্যই উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল—আবার তখনই না বলিল কেন!

জাহ্নবী বুঝিয়াছিল যে কেন সীতা যাইতে সম্মত নহে। সীতা যে কনককে না বলিয়া ঐ ঘরটির বাহির হইতে পারে না, অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অন্ধকার আকাশ।

কনক রাত্রে আহারে বসিয়াই বলিল—মা এলেন না কেন, সীতা?

চিরদিন উমাসুন্দরী নিজে বসিয়া কনককে খাওয়াইতেন, কখনই ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ মাকে না দেখিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মার ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন; নিদ্রিত কি না বুঝিতে পারিল না। দু'বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইল না।

ফিরিয়া আসিতে সীতা বলিল—খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল যে!

কনক অপ্রসন্নমুখে বলিল—মা কখন থেকে শুয়েছেন সীতা?

সীতা বলিল—সন্ধ্যের পরই।

কনক বলিল—অসুখ করে নি ত—দেখেছিলে?

সীতা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে উমাসুন্দরী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন—খেতে বস্, কনক।

কনক হাত দিয়া জননীর ললাট ও হাতের উত্তাপ দেখিয়া বলিল—এখনই শুয়েছিলে কেন মা?

উমাসুন্দরী বলিলেন—কেমন আলস্য বোধ হ'তে লাগল, একটু শুয়ে পড়েছিলুম, তুই বস।

কনক বসিতে বসিতে বলিল—অন্য অসুক কিছু করে নি ত?

উমাসুন্দরী সীতার পানে চাহিয়া বলিলেন—না।

সীতা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে এই দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিল। সে নিবিষ্ট চিত্তে ফল ছাড়াইতে লাগিল। কনক আহারের পর দু'টি বেলা বিবিধ ফল খাইয়া থাকে; অন্য দিন উমাসুন্দরী নিজে সম্মুখে বসিয়া ছাড়াইয়া রেকাবীতে সাজাইয়া দেন।

কনক খাইতে খাইতে বলিল—মাকে দাও না।

উমাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন—না বাছা, আমার পেন্সান হয়েছে।

কনক মুখ তুলিয়া মৃদু হাস্য করিয়া পুনরায় আহার করিতে লাগিল। মনের মধ্যে সে যে একটু আরাম অনুভব না করিল, তাহা নহে। সীতা নিজে সংসারের কাজকর্ম্ম করিলে মা যে একটু স্বস্তি পান—এই চিন্তাটিই তাহাকে আরাম দিল।

উমাসুন্দরী পুত্রের মনোভাব বুঝিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—আজ জাহ্নবী এসেছিল।

জানি।

সে বৌমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সাধাসাধি করতে লাগল—

কনক বলিল—কোথায়?

উমাসুন্দরী বিরক্তভাবে বলিলেন—বাড়ী। আমিও যেতে বল্লুম, তা ওঁর মত হ'ল না।

কনক এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—তাতে আর কি হ'য়েছে। না গেছে—না গেছে।

উমাসুন্দরী বিশেষ করিয়া কনকের মনের কথাটি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—গেলেই হত ভাল। সে 'বৌ বৌ' করে, এত যত্ন আত্তি করে, আমিও বল্লুম, গেলে মানটা বজায় থাকত।

কনক অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল বুঝা গেল না। তবে সে যে যাওয়ার সমর্থন করিল না, উমাসুন্দরী তাহা বুঝিলেন।

রাত্রে শয্যায় প্রবেশ করিয়া কনক বলিল—জাহ্নবী তোমায় নিতে এসেছিল সীতা

সীতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

গেলে না কেন?

ইচ্ছে হ'ল না।

কেন ইচ্ছে হ'ল না, সেইটে শুন্তে চাই।

সীতা দু'তিন মিনিট কথা কহিল না। তারপর বলিল—খেতে বসে তুমিই বা কেন বল্লে—না গেছে—না গেছে। কেন?

কনক বলিল—তুমি আগে বল।

তুমিই বল না কেন?

কনক বলিল—আমার ও কথাটার কোন মানে নেই। কিন্তু তুমি গেলে না কেন?

সীতা বলিল—আমারও না যাওয়ার কোন কারণ নেই—গেলুম না।

উভয়েই বুঝিল—কারণটি প্রকাশ হইল না।

কনক একটু পরে বলিল—গেলে হয়ত মা খুসী হ'তেন, সীতা! তাঁর মনে কষ্ট হ'য়েছে।

সীতা চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল—ইহাতে দুঃখের কি কারণ আছে। একদিন যাইব বলিয়াছি ত!

কনক মৃদুস্বরে বলিল—সংসারের কাজ কর্ম্ম সব তুমিই করছ?

সীতা কথা কহিল না।

কনক বলিল—সে ত ভালই। মার এখন বিশ্রাম করবার সময়।

সীতা কি বলিতে গেল, কথা বাহির হইল না।

কনক বলিল—জাহ্নবী কালও আস্‌বে?

সীতা মৃদু কণ্ঠে বলিল—কাল তোমার সঙ্গে আমি যাব—তার বাড়ী।

আমার সঙ্গে!

তুমি আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে। যাবে ত?

কনক অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তা যাব'খন। মা জানেন?

না—বলিয়া সীতা অন্য মনে আলোকটি উজ্জ্বল করিয়া দিল।

কনক সীতার হাত ধরিয়া বলিল—সকালেই মাকে বল'—বুঝলে?

বলব।

সীতা আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

কনক সস্নেহে তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল—ঘুম পাচ্ছে?

সীতা কথা কহিল না।

কনক পুনরায় বলিল—সীতা, ঘুম পাচ্ছে? আজ একটা গল্প পড়ে এলুম, শুন্‌বে?

সীতা উত্তর দিল না। কনকের এই ছেলেমানুষী ছেলে-ভুলানো কথায় তাহার যেমন হাসি পাইল, তেমনি বিরক্তি বোধ হইল। সে কি চিরদিন ইহাদের হাতে খেলার পুত্তলী থাকিবে!

শুন্‌বে না?

সীতা তাহার বাহুপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল—ছাড়, আমার ঘুম আস্‌ছে।

কনক আস্তে আস্তে অন্য দিকে ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। এই নব্য

যুবকটি কবিত্বের ধার দিয়াও চলিল না। অন্য কেহ হইলে অন্ততঃ কল্পনাতেও সীতার নিদ্রাতিশয্যের হেতুটি নির্ণয় করিয়া তোলপাড় করিত—সে কিন্তু কিছুই ভাবিল না। সীতা ছেলে মানুষ, রাত্রি হইয়াছে—ইহাই তাহার কাছে যথেষ্ট কারণ বোধ হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে সীতা অশ্রুভারানত কণ্ঠে বলিল—হ্যাঁগা, একটা কথা বলব?

কনকের নিদ্রাবেশ হইয়াছিল, সে সীতার সজল কণ্ঠ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। ফিরিয়া বলিল—কি সীতা?

সীতা বলিল—আমি কি চিরদিনই ছেলে মানুষ থাকব!

না, না—পাগল হ'য়েছ। কে বলে! তুমি যে বুড় মানুষ হয়ে গেছ—বলিয়া রহস্যচ্ছলে কনক তাহার গালটি টিপিয়া ধরিল।

সীতা বলিল—তবে—

কনক উঠিয়া বসিয়া আলোক জ্বালিয়া দিল। সেই আলোকে বর্ষাবারি ধৌত শেফালিকার মত সীতার পাংশু মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

সীতা বালিশে মুখ ঢাকা দিতেই, কনক স্নেহসিক্ত স্বরে বলিল—এত অভিমান! একটা রহস্যও সহ্য করিতে পার না সীতা!

সীতা মুখ তুলিল না, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—আর আদরে কাজ নেই তোমার!

কনক মূকের মত পাশে বসিয়া রহিল। তাহার অল্পবুদ্ধিতে এ সকলের কোন কারণই সে নির্দ্দেশ করিতে পারিল না।

সীতাও আর কিছু বলিল না।

কনক ভাবিতেছিল—একটা কারণ কিছু ঘটিয়াছে! কিন্তু সে কি! মা যে সীতাকে কিছু কঠোর বলিবেন—তাহাও সম্ভব নয়! আর বলিবেনই বা কেন? সীতা ত কোন অন্যায় করে নাই!

তবে কি জাহ্নবী? সেই কি কিছু বলিয়া সীতার মনে ব্যথা দিয়াছে? জাহ্নবী ত তেমন ছিল না। সে ত জাহ্নবীকে জানে। তাহার চেয়ে কে বেশী জানে!—কথাটা মনে পড়িতেই হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি সচকিত হইয়া উঠিল। দুর্ব্বল জরাজীর্ণ পাইলে রোগ গুলা যেমন বিকটাকার দৈত্যের মত দেহে চাপিয়া বইসে—সেইরূপ কনকের দুর্ব্বল চিত্তকে জাহ্নবীর স্মৃতি একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্ত পরেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। ভাবিল—না জাহ্নবী নয়। তাহা হইলে সীতা কালই সেখানে যাইতে চাহিত না।

তবে কি?

কখন সীতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কনক জানিতে পারে নাই। সীতাকে নিস্পন্দ নিদ্রিত জানিতে পারিয়া, বাতিটি নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। যতক্ষণ আলোক ছিল সে নির্নিমেষে সীতার মুখের দিকেই চাহিয়াছিল; অন্ধকারেও মেঘভরা স্থির আকাশের মত সীতার মুখ খানিই দেখিতে লাগিল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সখী সম্মিলনে!

রাত্রের মধ্যেই সীতা যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রভাতে সে উমাসুন্দরীর সম্মুখীন হইয়া বলিল,—আমি আজ ওঁর সঙ্গে ঠাকুরঝির বাড়ী যাব।

উমাসুন্দরী কোন কথা কহিলেন না।

কনক যখন জিজ্ঞাসিল—মা, সীতা যাচ্ছে—তখন তিনি বলিলেন—শুনছি ত!

হঠাৎ কনকের মনে হইল—এইখানেই কোন ব্যথা জমাট হইয়া যায় নাই ত!

তখনি মনে পড়িল—না। মা-ই ত তাহাকে যাইবার জন্য বলিয়াছিলেন।

সে আর বেশী কিছুই ভাবিল না।

জাহ্নবীর গৃহ সম্মুখে গাড়ী থামিতে, কনক সীতার হাত ধরিয়া বলিল—বিকেলে আমার সঙ্গেই ফিরবে ত?

হ্যাঁ—বলিয়া সীতা নামিয়া পড়িল। জাহ্নবী তাহাকে নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, নিঃশব্দে তাহার হাতটি ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

তাকে নিজের কক্ষে আনিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তো'কে না ছাড়ি?

সীতা মৃদু হাসিল, উত্তর দিল না।

জাহ্নবী বলিল—মনে কর্, আমি তোকে পাঠালুম না; গাড়ী এল—ফিরিয়ে দিলুম। কি হয় তাহলে? হাসি নয়, সত্যি বল্‌ছি,—কি হয়?

সীতা হাসিয়া বলিল—আমি নিজেই গাড়ী ডাকিয়ে যাই।

কা'কে দিয়ে ডাকাবে ম'শাই? আমার লোকজন—আমি বারণ ক'রে দেব।

হেঁটে চলে যাব।

চিনবে কি করে? কে পথ বলে দেবে?

সীতা হাসিয়া বলিল—রাস্তায় পুলিশ আছে, তা'কে বলব—বাড়ী পৌঁছে দিতে!

কার বাড়ী—কি করে' নাম করবে?

এইবার সত্যই সীতার ভাবনা হইল, কিন্তু সে তখনি ঠিক করিয়া ফেলিল, বলিল—ডাক্তারখানার নাম করব।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল—বুদ্ধি আছে রে!

একটু পরে বলিল—রাত্রে খেয়ে দেয়ে যাবি ত?

সীতা বলিল—আফিস ফেরৎ আসবেন।

কে? বলিয়া জাহ্নবী চুপ্ করিল। একটু পরে আবার বলিল—তা'কেও নামিয়ে নিলেই হ'বে।

সীতা সাগ্রহে বলিল—বেশ ত!

জাহ্নবী কি ভাবিয়া সহাস্যে বলিল—না ভাই, কাজ নেই সে—সবে। তোমার সাত রাজার ধনটি এলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।

সীতা ঘরের সাজসজ্জা দেখিতে দেখিতে বলিল—ঠাকুরজামাই কি এক দিনও আসেন না ভাই

জাহ্নবীর কণ্ঠে অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, এই প্রশ্নে সে কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল—না। এসে দরকারই বা কি ভাই ?

সীতা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে-যে অতিকষ্টে কি একটা অব্যক্ত যাতনা দমন করিতেছে, সীতা বেশ বুঝিল।

মৃদুস্বরে বলিল—দরকার নেই বই কি !

জাহ্নবী বলিল—সত্যি বলছি, দরকার নেই। এলে, অশুচির মত আমি ঘর ছেড়ে যেতুম।

সীতা নীরবে তাহার অশ্রুসজল চোখ দু'টির পানে চাহিয়া রহিল।

জাহ্নবী বলিল—আমাকে দেখে তোর দুঃখ হয় ?

সীতা উত্তর দিল না।

জাহ্নবী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি কিন্তু খুব সুখী। আজ আমার সুখের মাত্রা পূর্ণ হ'য়েছে, সীতা। তোকে পেয়েছি বলে !

সীতা নীরব। এই স্নেহপরায়ণা মেয়েটিকে যে-সে সোণার চোখে দেখিত—তাহা কে-না জানে! ইহার কোমলতায়, পবিত্রতায় সংসারের কাঠিন্য যে নিমেষে খণ্ড হইয়া যাইত—তাহার অনেক উদাহরণ সীতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার এই কথায় সীতা যেন বসিয়া গেল। সীতা ভাবিল—এ মুখে বলিতেছে বটে, কিন্তু আমি নারী

হৃদয় বুঝি ত—বুক উহার ফাটিয়া যাইতেছে! ঐ যে চোখ দু'টি-ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে—সে কি লুকাইবার!

জাহ্নবী বলিল—একদৃষ্টে কি দেখছিস সীতা?

সীতা বলিল—তোমার চোখ দু'টি।

এ কি কথনও দেখিস নি।

দেখেছি—কিন্তু কি যে ভাই তোমার চোখে আছে, দেখে আমার আশা মেটে না। সত্যি এমন চোখ আর দেখি নি ভাই।

জাহ্নবী রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার চোখের প্রশংসা না করিত কে! কিন্তু আজ এই তাহাপেক্ষায় কম বয়সের এই বধূটির স্তুতিতে সে যেন বিদ্ধ হইয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ জড়ের মত থাকিয়া, সহাস্যে কহিল—সেই জন্যেই ত তোর বরের সামনে বেরুই না।

সীতাও হাসিয়া বলিল—সে কবে থেকে ম'শাই? যে একবার দেখেছে—ও চোখ—সে কি ভুলতে পারে! কতদিন আমাকে বলেছেন—

জাহ্নবীর হৃদয়খানি যেন তাহার কাণ দু'টির সঙ্গেই হাঁ করিয়াছিল—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই সে বলিল—তোদের ভাল লেগেছে বলে কি সবাইয়ের ভাল লাগে।

সীতা বলিল—তাইত বলেন—মাণিকলাল যদি শুভদৃষ্টির সময় একবার জাহ্নবীর চোখ দু'টি দেখত—তা'কে এমন অনাদর করতে পারত না।

জাহ্নবী সাড়া দিল না। সে যে সেই মুহূর্ত্তে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে নিজেই জানিতে পারে নাই। সীতার প্রত্যেক কথাটি তাহার বুকের মধ্যে যেন আগুণের শিথার মত লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছিল।

ও কথা যাক্—বলিয়া জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

তুই একটু বস—তোর খাবার বন্দবস্ত করে আসি—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তাহার শ্বশ্রূ নীচে খাবার করিতেছিলেন—সে একেবারেই সেখানে যাইতে পারিল না। পাশের ঘরে ঢুকিয়া বুকের উপর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ইচ্ছা হইতেছিল—চীৎকার করিয়া কাঁদে—পারিল না। ভূতলে বসিয়া বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বক্ষের বসন ভিজিয়া লোহিতাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া তাঁহার শ্বশ্রূ বলিলেন—বৌমা, সীতা কি এখন খাবে? খাবার ত তৈরী হ'য়ে গেছে।

এই কথাই সে জানিতে আসিয়াছিল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না। বলিল—জেনে আস্‌ছি মা।

অর্দ্ধপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—খাবার দাও মা। আমি খাবার সাজাই, তুমি ডেকে নিয়ে এস।

সে যেন কিছুতেই তখন সীতার সম্মুখীন হইতে পারিতেছিল না।

সীতা আসিতেই জাহ্নবী নত আননে বলিল—বস বৌ।

তাহার শ্বশ্রূ বলিলেন—ও আবার বৌ হল তোর কবে থেকে! ও ত সীতা!

সীতা হাসিল, কিন্তু যাহাকে একথা বলা হইল, সে শুনিতে পাইল কি-না সন্দেহ। পাইলেও সেদিকে তাহার মন ছিল না।

একটু দূরে বসিয়া একটি পাঁচ ছয় বছরের উলঙ্গ বালক লুচি খাইতে

ছিল, জাহ্নবী তাহার পিঠে একটি কিল বসাইয়া দিল। বালক এক মুহূর্ত্ত বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া ভঁ্যা করিয়া [illegible] ফেলিল।

যা, কাপড় পরে আয়—বুড়ো ছেলে। বলিয়া জাহ্নবী তাহার লুচি শুদ্ধ পাতাখানি টানিয়া লইল।

বালক ভঁ্যা অঁ্যা করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

ওরে ও বিধু, শান্তকে একখানা কাপড় পরিয়ে দেত। বস না বৌ, দাঁড়িয়ে রৈলে কেন?

বালক কাপড় পরিয়া খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে দ্বার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নে—খেতে বস।

বালক ফোঁপাইতেছিল।

জাহ্নবী উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—বস, বাবা আমার বস। রাগ করতে আছে।

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পাতার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। রাগের ভরে অল্পক্ষণ খাদ্য স্পর্শ করিল না। জাহ্নবী আরও দু'তিনখানি লুচি পাতায় দিতেই বালক হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আহার্য্যের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল।

জাহ্নবীর শ্বশ্রূ বলিলেন—কি দেখ্‌ছ বৌ-মা। খাও মা, খাও। ও দিনরাতই ঐ হ'চ্ছে। ও'টি আমার মেজ মেয়ে দুর্গার ছেলে। বড় আমীর গলার হার। ও'কে নিয়েই বাছার আমার ঘর সংসার—যা বল তাই।

সীতা দেখিল—জাহ্নবীর নত নেত্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি—ভূতলে

ঝরিয়া পড়িতেছে। বন্ধ্যা রমণীর সুকোমল দয়ালুতার কথা সে অনেক শুনিয়াছিল, আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিল—যেমন অপূর্ব্ব, তেমনি অননুভূত। জাহ্নবীর সজল চোখের স্নেহ দৃষ্টি যে কেবলমাত্র সেই হৃষ্টপুষ্ট সুগৌর শিশুর পানেই আবদ্ধ আছে, ইহা দেখিয়া সে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। ইহাও সে বুঝিতে পারিল যে শিশুচিত্তও এই কোমলতায় ভরিয়া গিয়াছে—বালক পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া ভোজনে নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহে শুভদৃষ্টি হয় নাই।

সীতাকে খাওয়াইয়া, নিজের হাতে তাহার কেশবিন্যাস করিয়া জাহ্নবী তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। কনক নামে নাই, গাড়ীতেই বসিয়াছিল। জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী একবার নামিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, জাহ্নবী তাহাতে সাড়া দেয় নাই। তাহার কেমন ধারণা দৃঢ় হইয়াই ছিল যে কনক নামিবে না। অথচ ইহা ভাবিতেও সে বিস্মিত হয় নাই যে তাহার কোন কথাই কখনও কনক ঠেলে নাই।

গাড়ীতে যে একজন লোক বসিয়া আছে এবং সে-যে কনক তাহা জাহ্নবীর জানিতে বাকি ছিল না, কিন্তু সে এমনভাবে গিয়া সীতাকে উঠাইয়া দিল যে তৃতীয় ব্যক্তির সম্ভাবনাও যেন তাহার জানা ছিল

না। সীতা স্বল্প অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে ঈষৎ হাসিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, জাহ্নবী গাড়ীর দ্বার ছাড়িয়া দিতেই কনক বলিয়া উঠিল—তুমিও এস-না জাহ্নবী!

জাহ্নবী সেই চোখ দুটি একবারমাত্র তুলিয়া চাহিল। কোন কথা বলিবার তাহার ক্ষমতা ছিল না। এই চারিটি কথার সম্ভাষণে জ্বলন্ত অগ্নিতেজে তাহার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইতেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

ভিতরে আসিতে শ্বশ্রূ বলিলেন—কনককে নামতে না বলাটা ঠিক হয় নি মা!

জাহ্নবী এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া যেন বল সঞ্চয় করিয়া লইল। বলিল—তিনি ত আর কুটুম ন'ন, মা—এ বাড়ীর কোন লোকই তাঁর নতুন নয়।

সত্য বটে, জাহ্নবীর বিবাহ হওয়াবধি কতবার কনক এ গৃহে আসিয়াছে এবং তাঁহারাও সদাসর্ব্বদা তাহাদের গৃহে যাতায়াত করিয়াছেন—সে হিসাবে কনক নূতন বা অপরিচিত অভ্যাগত নহে, তাহা হইলেও সে যে বিনা আহ্বানে আর একজনের গৃহে অতিথি হইয়া দাঁড়াইবে—এ কথা জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি তর্ক করিবার মত লোক ছিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

জাহ্নবী আশা করিতেছিল—শ্বশ্রূ আরও কিছু বলিবেন। তাহার অন্তঃকরণটা যেন কি শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, যখন শ্বশ্রূ আর কিছুই বলিলেন না, জাহ্নবী মৃদুকণ্ঠে বলিল—সত্যি মা, একবার বল্লেই হ'ত।

শ্বশ্রূ সন্তুষ্ট মনে কহিলেন—হ্যাঁ মা, ওটা অন্যায় হ'য়েছে।

শেষে বলিলেন—তোমার আপনার বলতে, পর বলতে ঐ এক কনক

ছাড়া কে আছে বল? বৌ-ঝিরা ভাই বোন্ নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করে—বিধাতা ত তোর অদৃষ্টে সে সব লেখেন নি বাছা! ঐ একরত্তি আছে, পর হ'লেও ওরাই তোর সব। ওরা যা তোর করেছে—ভূভারতে ক'জন তেমন করে মা?—বলিতে বলিতে কৃতজ্ঞতায় প্রৌঢ়া বিধবাটির চিত্ত ভরিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্ত থামিয়া আবার বলিলেন—মানুষের মেয়ে হ'স যদি বাছা, ওকে কোনদিন অযত্ন করিস নে।

জাহ্নবী যে কত বড় আঘাত সামলাইয়া লইল, বিধবা তাহার কিছুই জানিলেন না। বলিলেন—ও-যে নিজের বোন্‌টির মত তোর বিয়েতে সব খরচই করেছে, তার জন্য দুঃখ কষ্টও ত তার কম ভোগ হয় নি—একথা আমি কোনদিনই ভুলব না।

জাহ্নবী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া একেবারে বিছানায় আছাড় খাইয়া পড়িল। এ কি নিদারুণ তীব্র পরিহাস তাহার সঙ্গে পৃথিবীশুদ্ধ লোক করিতেছে! আর এমনি নিরুপায় শক্তিহীন সে, যে তাহাই তাহাকে অম্লান মুখে সহ্য করিতে হইতেছে।

নদীর কূল একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে সে যেমন কোন বাধাই মানে না—আজ আর জাহ্নবী কোন মতেই সেই নিষিদ্ধ সুখচিন্তার দৃঢ় মুষ্টির মধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইল না।

শুধু এই বেদনাই প্রবল নহে। কনকের সস্নেহ আবাহনের সে একটা উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই, অথচ সেই শব্দটা তাহার কর্ণে একেবারে বিশ্বের মিলিত কোলাহলের মতই বাজিয়া উঠিয়াছিল। সে ত কতদিন সুনির্জ্জনে চিত্ত দমন করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, সফলও হইয়াছিল। আজ

আবার এমন করিয়া যে দুর্গপ্রাকার ভেদ করিয়া সেই দীন হৃদয়খানা বাহির হইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে—সে ত তাহার দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কনক কি ভাবিয়াছে কে জানে—আশ্চর্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিরক্তও হইয়াছে বোধ হয়। হাঁ না একটা উত্তর দিলে হয়ত এতটা বেশী বিরক্ত হইত না।

উপকারের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কনক এত লঘু চিত্ত নহে যে সেইটা লইয়া আন্দোলন করিবে কিন্তু তাহার আজন্ম স্নেহের বিনিময়ে এই অসৌজন্যটা কিরূপ লাগিয়াছে—তাহা কি আর বলিতে হইবে!

মৌচাকে সুবিধা মত একবার খোঁচা দিতে পারিলে সেই ছিদ্র পথে মধুটুকু নিঃশেষ হইতে থাকে—জাহ্নবীর চিত্তও ঠিক তেমনি নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল।

কনক তাহার চক্ষুর প্রশংসা করিয়াছে—সীতার কাছে এই নির্ম্মম সুসংবাদটি সে শুনিতে পাইয়াছে এবং এই টুকুর পিছনে যে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরের একটা ছায়াময় জীবন লুক্কায়িত আছে—সীতার কাছে প্রকাশ না হইলেও কনকের মনে যে উদয় হয় নাই—তাহা কে বলিতে পারে! কৈশোরে কনক সেই চোখ দুটির প্রশংসা করিত, তাহাতে বালিকার স্বচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদয়টি বায়ুতাড়িত তরঙ্গের মত নাচিয়া উঠিত, কিন্তু তাহার একটু নীচেই যে জ্বলন্ত পৃথিবী এমন উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহা ত সে পূর্ব্বে জানিত না।

নিজের কাছে আজ সে প্রথম ধরা পড়ে নাই। সে ত অনেক দিনই সে জানে! তাহাতে ত তাহার অশেষ সুখ ছিল—সেই বিশুদ্ধ সুখটিকে সবলে বক্ষে চাপিয়া সে ত সংসারের সকল উপেক্ষা অবহেলা

হাস্যমুখে এড়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ অপরের মুখে নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষার আভাষমাত্রে—অন্যের কাছে ত দূরের কথা—নিজের কাছেই যে এমন অপরাধীর মত লাঞ্ছনা পাইবে—তাহা সে কল্পনাতেও জানিত না।

কনক বলিয়াছে—শুভদৃষ্টিতে চোখ দুটির পানে চাইলে আর এমন হ'তে পারত না। তাহার দৃষ্টির প্রশংসা সকলেই করিত, কিন্তু সে প্রশংসা এমন করিয়া, তীক্ষ্ণ হইয়া ডাক্তারী অস্ত্রের মত বক্ষ কুচি কুচি করিয়া কাটে নাই। এত বড় একটা সত্য, একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের আস্বাদ ত অনুভূত হয় নাই।

যে শিশু নূতন কথা কহিতে শিখিয়াছে, সে যেমন সেই একটি কথাকেই বারবার আয়ত্ত করিতে থাকে—জাহ্নবীর উদ্বেল হৃদয় এই সত্যটিকে নানারূপে নানা বর্ণে শতবার গ্রহণ করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

পূর্ব্বস্মৃতি।

নিষিদ্ধ ইতিহাসটা এই।

অত্যন্ত সাদাসিদা ও নিতান্তই সাধারণ।

কনকের অতি দূর গ্রাম সম্পর্কের এক পিসি ছিলেন। শুনা যায়, সংসারে যত রকম অন্যায় অত্যাচার—সবগুলিই নির্ম্মম বিধাতা নির্ব্বিচারে তাঁহাদের

দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহের পর দিনই শাশুড়ী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। দ্বিরাগমনের অত্যল্প কাল পরেই শ্বশুর মারা যান, তাঁহার সঙ্গেই সামান্য জমি জমা যাহা ছিল, জ্ঞাতিরা সানুগ্রহে তাহা দখল করিয়া লয়। তাঁহার স্বামী কোথায় একটা কর্ম্ম করিতেন—কিন্তু বেশী দিন কাজও তাঁহাকে করিতে হয় নাই। বাতে পঙ্গু হইয়া তিনি অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। একে ত সেই অবস্থা, তাহার উপর রোগের সেবা ও ব্যয়।

শেষাশেষি ডাক্তার বৈদ্য ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, অর্থাভাবেও বটে আর উপকার না পাওয়াও একটা কারণ বটে। হঠাৎ এক সন্ন্যাসীর একমুষ্ঠি ছাই ভক্ষণ করিয়া ও একটা মন্ত্রসিদ্ধ তৈল মালিস করিয়া তিনি যেন পূর্ব্ব জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

নির্ব্বাণের মুখেই দীপটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারের হাহাকার দৈন্যের ছবিটা দূর হইয়া যেমন একটি শান্ত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল—ঠিক সেই সময়ে তিনি অকস্মাৎ সর্ব্বরোগমুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কন্যাটি ছয় মাসের।

কনকের মা আত্মীয় বান্ধবহীনা বিধবা জগৎতারাকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন।

কনক এই সময়ে একটি আধটি কথা কয়, টলিতে টলিতে চলে—ছ'মাসের শিশু জাহ্নবীকে দেখিয়া বলে—এ তে-ম্মা? তানতবি! দলা তিপে দে।—ছ'মাসের শিশু মিট্ মিট্ করিয়া চায়, দেড় বছরের কনক বলে—পুত্ পুত। তোক্ গে দে।

জগৎতারা—যাঁহার ধারণা ছিল যে তিনি পৃথিবীতে একটি ধূম-কেতু এবং অমঙ্গলের সমষ্টিমাত্র—তাঁহার ভয়াবহ পরিণামও বাস্তবিকই

অমঙ্গলময় হইয়াছিল। তিনি বহুদিন যাবৎ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন সঙ্গের দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পিসীমা নেই মা, ভেসে গেছেন।

বিস্তর অনুসন্ধান হইল—শবদেহ মিলিল না।

উমাসুন্দরী সন্দেহ করিয়াছিলেন—আত্মহত্যা।

পিতৃমাতৃহীনা শিশু উমার কোল অবাধ অধিকার করিয়া বসিল।

বড় হইয়াও কলমের শাখাটির মত সে এই পরিবারের জীবনীশক্তিতেই পুষ্টিলাভ করিতেছিল। অন্য বৃক্ষের শাখা লইয়া যে কেহ তাহাকে কলম বাঁধিয়া দিয়াছে, সে-যে কেবলমাত্র ইহাদের আশ্রিত, তাহা সে কোন দিনই জানিতে পারে নাই।

মেয়েটির নাম ছিল—জাহ্নবী। শিশিরস্নাত কুন্দমল্লিকার মত শুভ্র বালিকাটি! শীতের প্রভাতে রবিকরস্নাত ক্ষুদ্র তটিনীটির মত!

কোন্ একটা উপন্যাসের মত, ছেলেটি ডাক্তারি পড়িত, মেয়েটি তাহার ছুরি কাঁচিগুলি ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়া দিত। অসাবধানতা বশতঃ হাতটি কাটিয়া ফেলিয়া- সেই ছাত্র-চিকিৎসকের কাছে ম্লানমুখে সভয়ে আসিয়া দাঁড়াইত, ছাত্র চিকিৎসা অধীত জ্ঞানরাশি মন্থন করিয়া ঔষধ প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া বলিত—আর হাত দিও না। ক্ষণিকের জন্য এই ভীতি বালিকাকে সঙ্কুচিত করিলেও বিরত করিতে পারিত না। এই জিনিষগুলি নাড়াচাড়ার মধ্যে তাহার যে একটা আকর্ষণ ছিল—আর কেহ না জানিলেও বালিকার কুসুম-পেলব চিত্তটি বুঝিতে পারিত।

ছেলেটি নানান ছবি আঁকা বই খুলিয়া যৌবনোন্মুখী কিশোরীকে নিজের অগাধ পাণ্ডিত্যের সরল সরস তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দিত। মেয়েটি

মুগ্ধনেত্রে বক্তার পানে চাহিয়া থাকিত। যতটা পারিত বুঝিত, না পারিলে বলিত—আচ্ছা কেন ও রকম হ'বে। এ রকম হলেই ত পারত!

নবীন ডাক্তার বলিল—হ'লে ত—পারত, কিন্তু সে যখন হয় নি…

এ যুক্তি সে বুঝিল না, বলিল—কেন হ'ল না, তাইত তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি। তুমিও বুঝি জান না?

ছাত্র-চিকিৎসক রাগ করিল। চোখ তুলিয়া কি বলিতে গেল—সে চোখের হাসির ছটায় গলা দিয়া কথা বাহির হইল না।

মেয়েটি অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না, না কনক। তারপর—বল।

কনক আবার বলিতে লাগিল—এই মনটি হচ্ছে যেন ঘড়ির স্প্রীং—তা'তে যতক্ষণ দম আছে—সব ঠিক চলছে। হাত পা-গুলো যেন ঘড়ির কাঁটা—সব ঠিক ঘুরছে। দমও শেষ হল—ঘড়িও বন্ধ। এও তেমনি—মন বিগড়েছে—কি সব অচল।

এই অভ্রান্ত সত্যটি বলিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তিনীর মুখের পানে চাহিল—আবার সেই দৃষ্টির সেই মোহ।

মেয়েটি বলিল— ও ত জানা কথা।

কনক বলিল—তোমার ত সবই জানা দেখছি। তবে আর কি বলব—বলিতেই জাহ্নবীর হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটির পানে চাহিয়াই চুপ করিল।

জাহ্নবী কৃত্রিম রোষপূর্ণ স্বরে বলিল—আর বলতে হ'বে না—আমিও বুঝেছি।—বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া গেল। তাহার এই অবজ্ঞাসূচক গমন ডাক্তারের পক্ষে যত নির্ম্মমই হোক, মোহটা ছিল তার চেয়ে বেশী। কাজেই ডাক্তার নিজেই আবার কোন সময়ে তাহাকে ডাকিয়া বই খুলিয়া বসিত।

বলা বাহুল্য সে অভ্যাস ছাড়িতে পারিল না, শেষাশেষি কনকও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এই সময়ে আর একটি পরিবারের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে এই জাহ্নবীর শ্বাশুড়ীর পরিবার। তিনি প্রায়ই আসিতেন, এক দিন কনকের মাকে বলিলেন—দিদি, তোমার এই কুড়ানো মেয়েটি আমাকে দাও।

জাহ্নবী সেখানে বসিয়াছিল—নিজ জীবনের কোন গোপনতাই তাহার ছিল না, আজ হঠাৎ এই কথায় সে সচকিত হইয়া উঠিল।

কনকের মা—উমাসুন্দরী বলিলেন—কে বল্লে দিদি, জাহ্নবী আমার কুড়ানো মেয়ে! ও ত কনকেরই বোন্।

মাণিকের মা বলিলেন—আমার মাণিকের সঙ্গে ওর বিয়ে দাও। জানত মাণিকের আমার রেলে কর্ম্ম হয়েছে, মোটা রোজগার—তা ছাড়া গাড়ী ঘোড়া—ইত্যাদি।

তাঁহার পুত্রগুলিকে উমাসুন্দরী জানিতেন। মাণিকলাল জ্যেষ্ঠ—বেশ বড় কণ্ট্রাক্টরী করিতেছে, মেজটি ডেপুটিগিরি পাইয়াছে, ছোটটি তখন বি-এ ক্লাশে পড়ে। মাণিকলাল ও মোহনলাল হইতেই এই দরিদ্র বিধবার সংসার স্বচ্ছল ও সুখের হইয়া উঠিয়াছে—তাহাও জানিতেন।

কিন্তু আসল কথাটি তাঁহার অগোচর ছিল। মাণিকলাল রেলে "কাঁচা" পয়সা পাইতেই "পাকা" আমোদে ডুব দিল। প্রথম প্রথম রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া বলিত—...রেলের কাজ কেউ যেন না করে। পরে যখন বাড়ী আসা বন্ধ হইল, বলিল—উঃ..., খাট্‌তে খাট্‌তে প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ... দিনে রেতে ছুটোছুটি, যুদ্ধটা বেঁধেই এই হাঙ্গামা। লোকে কিন্তু সন্দেহ করিল—কলিকাতার উত্তর বিভাগের কোন স্থান বিশেষে

রাত্রের সমস্তটাই অতিবাহন হইয়া থাকে এবং উক্ত পল্লী নিবাসিনী অনেকেই এই নব্য রেল বাবুটির সুখ্যাতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাণিকলালের জননী অন্য সাধারণ জননীর মতই প্রথমটা বিশ্বাস করেন নাই। একটি সচ্চরিত্র যুবক (মোহনের বন্ধু) কথাচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—তুমি কি চোখে দেখে এলে নাকি নরেশ?

নরেশ আর কি বলিবে।

কিন্তু বেশী দিন অবিশ্বাসটি রহিল না। একদিন মাণিকলালের রঙীণ চক্ষু দুইটি ততোধিক রঙীণ ভাবটি তাঁহাকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দিল।

তাই প্রথম মুহূর্ত্তেই এই মেয়েটির আশ্চর্য্য সুন্দর চক্ষু দু'টি দেখিয়া মোহময় রূপ-শৃঙ্খল কল্পনা করিয়া উড্ডীয়মান পুত্রটির পদে বাঁধিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন—দিদি, বেশী কিছু দিতে থুতে হ'বে না। শুধু গহনা তুমি যা দেবে—দিও।

উমাসুন্দরী বলিয়াছিলেন—তা কেন? আমার মেয়ে—কি অমনি তুলে দিতে পারি আমি! কনকের আমার কিসের অভাব যে সে দীন দুঃখীর মত বোনটির বে দেবে!

একটি আশ্রিত পালিত কন্যার ভারই দুর্ব্বহ,—উমাসুন্দরী যে তাহার বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবেন, ইহা মাণিকলালের জননীর অজ্ঞাত ছিল।

বিবাহের দুই চারিদিন পূর্ব্বে কনক জাহ্নবীকে জিজ্ঞাসিল—কি উপহার দেব তোমাকে বল।

জাহ্নবী দীপ্তনেত্রে চাহিয়া বলিল—আমি কি জানি! ন্যাকামী!

ন্যাকামী যে-কি কনক তাহা বুঝিল না। সে সরল হাস্যের সহিত

বলিল—একখানা রঙীণ চশ্‌মা দেব গড়িয়ে—চোখে দেবে বুঝলে—চোখ্ দু'টো ঢাকা থাক্‌বে। আর একটা জিনিস দিতে পারতুম, একরকম ওষুধ আছে, দিলে চোখ্ দু'টির বাহার একেবারে শেষ হ'য়ে যায়—তবে তা'তে করে দৃষ্টিও নষ্ট হ'য়ে যাবার ভয় আছে—তাই দিলুম না।

জাহ্নবী চোখ্ তুলিয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে এবং সেই আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি দীর্ঘ ঋজু দেহ ডাক্তারের পানে রাখিয়া যেন বলিল—তাই দিয়ে দাও।

কিন্তু মাণিকলালের জননীর বড় আশায় ছাই পড়িল। সেই চোখের দৃষ্টি চমৎকারিতা তাঁহার পুত্রকে বিদ্ধ করিতে ত পারিলই না, উপরন্তু তিনি বুঝিলেন—সেই প্রফুল্ল দৃষ্টিটাই যেন ম্লান, কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

উমাসুন্দরী সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিকলালের জননী যে তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন—ইহা জানিয়া তিনি কোন মতেই তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। এই নিদারুণ দুঃসম্বাদটি ফুলশয্যার রাত্রেই আহার করিতে গিয়া কনক মাণিকলালের প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছিল। কনক বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার মাতাও সাপরাধ অনুশোচনায় মরিয়া যাইতেছিলেন।

সাতদিন পরে জাহ্নবী ফিরিয়া আসিল। জাহ্নবীকে অম্লান প্রফুল্ল দেখিয়া উমাসুন্দরী বিস্মিত হইলেন। তাহার ব্যথাক্ষুণ্ণ মুখ কল্পনা করিয়া মাতাপুত্রে কত না কষ্ট পাইতেছিলেন। সে যখন পূর্ব্বের মতই সহাস্যমুখে ফিরিয়া আসিল, কনক মনের মধ্যে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিয়াছিল।

কয়দিন থাকিয়া জাহ্নবী শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তদবধি সে কখনও কখনও মধ্যাহ্নে আসিয়া উমাসুন্দরীর কোলের কাছে শুইয়া পড়িত। উমাসুন্দরী মাঝে মাঝে থাকিতে বলিতেন, জাহ্নবী থাকিত না। যে গৃহে

তাহার কোন আকর্ষণই নাই—সেই নিঃসম্পর্ক ইষ্টক প্রস্তরময় গৃহখানিকেই সে দুর্নিবার শক্তিতে আপনার বলিয়া টানিতেছিল।

ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পরের কথাই আমরা বলিতেছি। ছয় বৎসরের মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটে নাই—কনক মার সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরিয়া লাহোরে ঘি দুধ খাইয়া ও মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিল, আর জাহ্নবী সদ্যঃ প্রাপ্ত সংসারটির কাজ-কর্ম্ম, হাসি গল্পের মধ্যেই বোধ করি ডুবিয়া মরিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দুর্ব্বোধ্য।

সেদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই সে শ্বশ্রূকে কহিল—মা কনককে আজ বল্‌ব?

তাহার শ্বশ্রূ বলিলেন—বল না। বেশ ত!

জাহ্নবী জানিত, তাহার শ্বশ্রূ এই বিষয়টিতে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একদিন যে তিনি বড় আশা করিয়া জাহ্নবীকে গৃহে আনিয়াছিলেন এবং সেই আশা বিফল হইয়া জাহ্নবীর নারী জন্ম বৃথা করিয়া দিয়াছেন, কনক ও উমাসুন্দরীর কাছে তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। কিন্তু যখন তিনি সেই মাতাপুত্রের ক্ষমা এবং পূর্ব্বেকার স্নেহ ফিরিয়া

পাইয়াছিলেন, তখন মাতা-পুত্র দু'টির কাছে তাঁহার মনটি একেবারে বিক্রীত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহাই হইয়াছিল, জাহ্নবীর কাল! জাহ্নবী চাহিত না যে তাহার শ্বশ্রূ কনককে সদা সর্ব্বদা আহ্বান করেন। অথচ হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে শ্বশ্রূর কৃতজ্ঞতাটুকু যে মাধুর্য্য উৎপাদন করিত তাহা অস্বীকার করিতেও পারিত না। কনক আসিত না,—ইহাতে তাহার যেমন সুখ ছিল, কেন আসে না—এ কথায় দুঃখও তেমনি কম ছিল না।

এমন কতদিন ঘটিয়াছে, জাহ্নবী ও-বাড়ীতে আছে, কনক গৃহে ফিরিয়াছে—কিন্তু দ্বিতলে আসে নাই। আসিলেও সকলের সাক্ষাতে নিতান্ত সাংসারিক দু'একটা কথা কহিয়া সরিয়া পড়িয়াছে—জাহ্নবীর পক্ষে ইহা কম আরামপ্রদ ছিল না।

আজ সে তাহার কনিষ্ঠ দেবরটিকে বলিল—একটি কাজ করতে হ'বে।

দেবর নব্য যুবক। এম্-এ পড়ে। বিবাহ হয় নাই। বলিল—শুনি?

জাহ্নবী বলিল—আমাদের বাড়ী গিয়ে—কনককে বলে আস্তে হ'বে যে রাত্রে সে এখানে খাবে।

দেবরের নাম হিরণলাল। সে হাসিয়া বলিল—তোমাদের বাড়ী কি রকম?

জাহ্নবী বলিল—আহা! খুঁত ধরেই বসে আছ আর কি! সত্যি ঠাকুরপো, ওটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হিরণ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাক্। তা' এখন ত নয়—ওবেলা কলেজ ফেরৎ যাব।

জাহ্নবী বলিল—তখন তার দেখা পাবে কোথায়? লক্ষ্মী ভাই—এখন একবার যাও। তোমার······

হিরণ সহাস্যনেত্রে চাহিয়া বলিল—না, না—আর কিছু বলতে হ'বে না। আমি যাচ্ছি।

সে চলিয়া যাইতেছে, জাহ্নবী ডাকিয়া বলিল—দেখ, কোন আপত্তি শুন না। আনা চাই।

হিরণ হাসিয়া বলিল—বলব, হুকুম নেই! আচ্ছা—সে হাসিয়া আর একবার জাহ্নবীর চোখের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল।

জাহ্নবী এক মুহূর্ত্ত নিঃস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে নীচে নামিয়া গেল।

সীতাকে সে নিজের অনুপাতেই শিক্ষা দিয়াছিল। এত বড় সংসারের এমন কাজ খুব কমই আছে—যাহাতে জাহ্নবীর না হাত পড়ে। অথচ তাহারই মধ্যে সে সময়মত কঠোর বার-ব্রত, স্নান-দান সবই করিয়া থাকে।

আজও গৃহকর্ম্ম তাহার অপেক্ষায় ছিল। সে তাহাতে লাগিয়া গেল। কিন্তু হিরণকে পাঠাইয়া অবধি সে একটু সচকিত হইয়াই ছিল। সে-কি, সংবাদ লইয়া ফিরিবে! কনক কি প্রত্যাখ্যান করিবে? কখনই তা সে পারিবে না।

আবার ভাবিতেছিল—বলা যায় না। সে হয় ত সেই অসাধ্য কার্য্যই করিয়া বসিবে।

কিন্তু না—হিরণ আসিয়া বলিল, বৌ, সকাল সকাল সব তৈরী কর। কনক সন্ধ্যাবেলাই আসবে।

আসিবে—আসিবে—এই কথাটাই তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। হিরণ বলিল—প্রথমে হেন ত্যান কতকগুলো ওজর করছিলেন—আমি বল্লুম সে সব হ'চ্ছে না ম'শাই। যাবেন কি-না—বলুন।

জাহ্নবী উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল, হিরণ বলিল—শেষ বল্লেন—তা যাব।

হিরণ সহাস্যে বলিল—আমি বল্লুম—পথে আসুন।

জাহ্নবী পান সাজিতেছিল, নতমুখে খিলিগুলি মুড়িতে লাগিল, হিরণ বলিল—আর কিন্তু আমি যাব না বৌ।

জাহ্নবী সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাহিতেই সে বলিল—ও রকমের গম্ভীর লোক আমি পছন্দ করি নে। দরকারের বেশী একটা কথা কইতে যেন কনকের কষ্ট হয়। ওকি ভাই?

জাহ্নবী চুপ করিয়াছিল।

হিরণলাল সোৎসাহে বলিল—তুমি বিশ্বাস করছ না, ভাবছ বুঝি, আমাদের এতকালের কনক—তা'কে আর আমি জানিনে—সে আবার গম্ভীর কোথায়? আমিও ত তাই জানতুম। বুঝলে না? সে ত আমাদের বাড়ীতে আসত—কত হাসি কত গল্প করত। এখন আর সে সব নেই—বুঝলে? এখন ইয়া গোঁফ—ইয়া গম্ভীর।—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

জাহ্নবী কথা কহিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হিরণ ভাবিল, তাহার বিশ্বাস হয় নাই,—বলিল—হ্যাঁ গো। আমি কি মিছে বলছি। ও রকম গম্ভীর লোক দেখলেই আমার ছেলে বেলাকার মহেন্দ্র মাষ্টারকে মনে পড়ে। সত্যি বলছি বৌ, তিনি গুরু লোক, শিক্ষক—নিন্দে করব না, কিন্তু তাঁর পোড়ারমুখে একটি দিনের জন্যে হাসি দেখিনি। বাছার মুখখানি যেন পুড়েই আছে।

জাহ্নবী বলিল—কিন্তু যা বললে এ ত নিন্দা নয়, দেখো—

হিরণ হাসিয়া বলিল—তাই ত! ওটা অন্যায় হ'য়ে গেছে—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

জাহ্নবী কনকের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতুটা বুঝিতে পারিল না। অথচ হিরণ যাহা দেখিয়া আসিয়াছে তাহাতে ত সেই রকমই বুঝা গেল।

হাতের কাছের জিনিষটার সন্ধানে অনেকদূর ঘুরিয়া আসিয়া যখন হাতের কাছে পাইয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়—জাহ্নবীও কনকের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সহিত নিজের মনের যোগ জানিতে পারিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অথচ সেদিন গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময় নিজের আচরণটা মনে করিয়া সে কনককে দোষ দিতেও পারিল না।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, কনক আসিল না। জাহ্নবী অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার শাশুড়ী ত ক্রমাগত হিরণকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, সে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। জাহ্নবী তাহাকে কিছুই বলে নাই। সে যাহা জানিত, সবই বলিয়াছে—নূতন করিয়া কি বলিবে।

শ্বাশুড়ী বলিতেছিলেন—অসুখ বিসুখ করল না-কি ইত্যাদি।

জাহ্নবী অসুখ-বিসুখের কথা ভাবে নাই। সে নিজের মনকে সতর্ক করিতেছিল যে সে কিছুই ভাবে নাই। কিন্তু তাহা ত নয়। সে ভাবিতে-ছিল—হয় ত-ঐ সঙ্গে সীতাকে আসিতে বলিলেই ঠিক হইত।

কিন্তু কেন? একা আসিতে কনকের আপত্তি কিসের?

মনের ভিতর একটা বিরুদ্ধ ভাবনার খোঁচা উঠিলেই, লোকে কণ্ঠের বলে তাহাকে যেমন চাপিয়া ফেলিতে চায়—জাহ্নবীও বারবার তেমনি বলিল—কিসের আপত্তি!

তাহার চিন্তার গতি অথবা ঘড়ির কাঁটা—কোনটা যে দ্রুত চলিতেছিল,

জাহ্নবী ঠিক করিতে পারিল না। ঢং করিয়া ঘড়িতে সাড়ে আটটার ঘা বাজিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রূকে বলিল—মা, আমি একবার দেখে আসি।

গাড়ীর মাথায় বেহারীকে বসাইয়া সে যখন সেই পরিচিত গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইল, বেহারী নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

জাহ্নবী বলিল—বেহারী, তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এস।

বেহারী ভিতরে প্রবেশ করিতেই কনক বলিল—এই যে বেহারী। চল আমি যাচ্ছি। গাড়ী কস্‌তে গেছে

বেহারী বলিতেছিল—গাড়ী আছে—

কনক ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—বাঃ—চল তবে।

বেহারীর পিছনে জুতার যে মৃদু শব্দ উত্থিত হইতেছিল—তাহা অনুভব করিয়াই জাহ্নবীর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে একধারে ঠেসান দিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বসিল।

কনক পা-দানে পা দিতেই বলিয়া উঠিল—তোমার গাড়ী নেই?

কে? জাহ্নবী!—বলিয়া কনক পা নামাইয়া লইল।

তুমি এসেচ—নাম নি কেন? এ গাড়ী ছেড়ে দাও, আমার গাড়ী আস্‌ছে—তা'তেই যাওয়া যাবে। নেমে পড় জাহ্নবী। এই বেহারী, কত ভাড়া হ'য়েছে?—বলিয়া কনক গাড়ীর ক্ষীণ আলোর নিকটে সরিয়া ব্যাগ খুলিতেই জাহ্নবী বলিল—যাতায়াতের ভাড়া হ'য়েছে।—

ও-হ! তবে চল—বলিয়া কনক উঠিয়া পড়িল।

নামিবার প্রস্তাবে জাহ্নবীর মনে অনেক দ্বিধা উঠিয়াছিল—কিন্তু

একবার ভাবিল বলে—মামীর সঙ্গে

দেখাটা করে আসি, কি সীতাকে একটা কথা বলে আসি—এই রকমের একটা কিছু—কিন্তু গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সে গাড়ীতে ঝুলান একটা চামড়ার মধ্যে দুটি হাত পুরিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

কনক বলিল—বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে না? কি করি—বল! আফিস থেকে ফিরতেই একেবারে দু'টি ঘণ্টা দেরী! এক মহা ফ্যাসাদ!

সেই অন্ধকারের মধ্যে জাহ্নবীর চোখ্ দু'টির ঔৎসুক্য জানিতে পারিয়াই কনক বলিল—আমার একটা পেটেন্ট ওষুধের বাজারে ভয়ানক জাল হ'চ্ছে—আজ বিকেলে হঠাৎ সন্ধান পাওয়া গেল—যারা জাল করছে—পুলিস তাদের ধরেছে। সেই সব হাঙ্গামা মিটিয়ে আস্তে দেরী হ'য়ে গেল।

একটু থামিয়া আবার বলিল—কিন্তু তুমি কেন এত কষ্ট করে আবার এলে? বেহারীকে কি আর কাউকে পাঠিয়ে দিলেই পারতে!

জাহ্নবী নিরুত্তর।

কনক হাসিতে হাসিতে বলিল—তোমার বুঝি সন্দেহ হ'য়েছিল—আমি এলুম না, না

জাহ্নবীর ইচ্ছা হইতেছিল, বলে—হ্যাঁ, সেই ভয়ই তাহার হইয়াছিল—বলা হইল না। তাহার কণ্ঠের উপর তাহার নিজের যে কোন ক্ষমতাই ছিল না, ইহার আগে সে জানিত না।

কনক বলিল—সে তোমার মিছে সন্দেহ। তোমার নিমন্ত্রণ কি আমি ত্যাগ করতে পারি?

জাহ্নবীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল, এসময় এখানে আর কেহ থাকিলেই ভাল হইত।

কনক বলিতে লাগিল—কোন মতেই পারিনে। আর কেনই বা

করব—বুঝলে না ? তার ওপর সীতার মুখে শুনে অবধি আমার একটা লোভ দাঁড়িয়ে গেছল।—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

এতক্ষণে জাহ্নবী সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কনক বলিল—আজ সে তোমার ওপর ভারি চটেছে, জাহ্নবী। তা'কে তুমি বাদ দিয়ে ভাল করনি। আমাকে ভাঙ্‌চি লাগিয়েছিল, বুঝলে ? পেরে উঠলো না।—কনক পুনরায় হাসিতে লাগিল।

কিন্তু এত সহজ কথার উত্তরেও জাহ্নবী একটা সাড়া পর্য্যন্ত দিতে পারিল না।

আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, জাহ্নবী রেকাবিতে ফল মূল সাজাইয়া আনিতেই কনক হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এখনও মনে আছে ?

জাহ্নবীর সমস্ত মুখখানা যেন একবার রাঙা হইয়া তখনই সাদা হইয়া গেল ; সে শান্ত সংযত স্বরে বলিল—না—ভুলে গেছি।

কিন্তু এই সহজ কথাটার শুষ্কতা কনকের কানে বাজিল। সে তখনি বলিয়া উঠিল—এ ত তোমাদের বড় রাস্তা, একখানা গাড়ী কিম্বা ট্যাক্সি আনতে বলে দাও।

জাহ্নবী পরিহাস তরলকণ্ঠে বলিল—এত তাড়া !

কনক সহজভাবেই বলিল—না, ফিরতে রাত করা আমার অভ্যাস নেই—এ ত তুমি জান ?

জানিলেও এই কথাটিই আজ জাহ্নবীর কাছে একেবারে নূতন বলিয়া ঠেকিল। ইহা যে কেবলমাত্র অভ্যাসগত নয়—ইহার পশ্চাতে আর একজনের অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টির সতর্কতা আছে—তাহাই যেন তাহাকে বেশী করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল।

সে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—দিচ্ছি।

কনক বলিল—অনেক দিন তোমার সামনে বসে খাই নি, জাহ্নবী! এ-যেন সেই ছেলেবেলা, না?

সে-কাল ভাবিতে পারিলেও সুখ ছিল, কিন্তু এখনি এমন একটা কথা হইয়া গিয়াছে—যাহাতে সে ভ্রম করাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

কনক পুনরায় বলিল—সত্যি বল্‌ছি জাহ্নবী, আমার সেই সব অভ্যাসগুলি তোমার ঠিক মনে আছে? কোন-টা ভোলনি ত!

জাহ্নবী এবারেও সাড়া দিল না। সে যে একটা উত্তরের জন্য নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিতেছে তাহা বেশ বুঝা গেল।

আচ্ছা—এই যে খাওয়ার পরে আমি ফল খাই—এটা সত্যি তোমার এতদিন মনে আছে? কম দিন নয় ত!

ইহার ত সহজ উত্তর ছিল যে, সে প্রায়ই তাহাদের বাড়ী গিয়া থাকে, জানা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু জাহ্নবী এ উত্তর দিল না।

সে দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—মানুষের মনটাকে কি ভাব তোমরা—তা ত জানি নে!—বলিয়া সে গাড়ীর সন্ধান করিতে গেল।

কনক একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ভাবিল—একি! এবং ইহার অর্থ কি!

নানা কথা ভাবিয়াও ইহার কোন ন্যায় সঙ্গত মীমাংসা সে করিতে পারিল না, তবে তাহার মন বুঝিল, সে যাহা ভাবে নাই, অথচ চাহিত, চাহে নাই অথচ যেন প্রাপ্য, পায় নাই কিন্তু দুরাশা নয়—এমনি একটা ভাব তাহার সর্ব্বাঙ্গ—পুলক শিহরিত করিয়া তুলিতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

কনক মুক্তহস্ত।

সীতা উমাসুন্দরীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—মা, নিশীথ দা বিলেত যাচ্ছেন!

উমাসুন্দরী বলিলেন—তার এখানকার পড়া শেষ হ'য়ে গেল?

সীতা বলিল—হ্যাঁ, এই দেখুন-না-মা চিঠি পড়ে। নিশীথ দা'ই লিখেছে।

উমাসুন্দরী পত্রখানি হাতে লইয়া চশমার অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিলেন—তুমিই পড়।

সীতা পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল। নিশীথ সীতার পিতৃগৃহে পালিত একটি অনাত্মীয় ভ্রাতা। সে লিখিয়াছে—গভর্মেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া সে বিলাত যাইতেছে। যাইবার পূর্ব্বে এক দিন আসিয়া সীতা ও কনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া যাইবে এবং সীতার শ্বশ্রূদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া আসিবে।

নিশীথ দু'তিনবার সীতাকে লইতে এবং রাখিতে আসিয়াছিল—উমাসুন্দরী তাহাকে দেখিয়াছিলেন। দরিদ্রের বেশভূষা, ধনী গৃহে পালিত হইলেও সরল যুবকটির মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

উমাসুন্দরী সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন—বেশ, বেশ। নিশীথের যে ভাল হবে—এ প্রথম দিন তাকে দেখেই আমি জেনেছিলুম। দেখ বৌমা, আমি

বলি কি! সে যদিও আসতে চেয়েছে নিজে—তার আগেই আমরা তাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিই।

সীতা নীরবে বসিয়া রহিল।

হ্যাঁ—কনক এলেই আজ আমি বলব—তুমিও বল'।

সীতা তথাপি বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছে দেখিয়া উমাসুন্দরী শান্তস্বরে বলিলেন—আর কিছু বলছ?

সীতা তাঁহার পায়ের আঙুলগুলির মধ্যে হস্ত চালনা করিতে করিতে বলিল—মা, নিশীথ দা'কে একটা উপহার ত দিতে হ'বে।

একটু থামিয়া বলিল—আপনার সেই বইখানাতে পড়েছি—

উমাসুন্দরী সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—মুক্তির পথে! পড়েছ—বুঝি! কোথায় পেলে?

সীতা মৃদু অনুনয়ের স্বরে বলিল—বৈঠকখানার আলমারীতে ছিল। বাবার বই।

উমাসুন্দরীর মনে পড়িল—প্রত্যেক বইখানি যখন বাহির হইয়াছে—স্বতন্ত্র কাগজে, স্বতন্ত্র কালিতে একখণ্ড করিয়া ছাপিয়া সুন্দর বাঁধাই করিয়া তাঁহার জীবনদেবতার হাতে উপহার দিয়াছিলেন। উমাসুন্দরীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

দু'তিন মিনিট পরে বলিলেন—বইখানা সেখানেই রেখে দিয়েছ বৌমা!

হ্যাঁ মা, সেগুলি ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে রেখে এসেছি। আর ··

আর কি?

আর আপনার কবিতার একটি বই ছিল—তার মলাট ছিঁড়ে গেছ'ল সেটা আমি বাঁধতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

উমাসুন্দরী প্রশংসমান দৃষ্টিতে সীতার মুখের পানে চাহিলেন। এ-যে কত বড় তৃপ্তি, কি বিশুদ্ধ সুখ—তাহা উমাসুন্দরী একান্ত মনে বুঝিলেন। পাঁচ ছয় মিনিট পরে বলিলেন—নিশীথকে কি দেবে বল?

সীতা বলিল—একটা সোনার ঘড়ি দিলে হয় না?

উমাসুন্দরীর মনে পড়িল—তাঁহার গ্রন্থে সরযূ সোমনাথকে তাহাই দিয়াছিল। বলিলেন—বেশ।

সীতা একটু থামিয়া বলিল—একটা লকেট থাকবে, তা'রি ভেতর নাম লিখে দেব।

সরযূ নিজের ক্ষুদ্র একটি ফোটো পুরিয়া দিয়াছিল। সে অবিবাহিতা ছিল এবং—থাক্—সীতা যে ফটো দিতে না চাহিয়া নাম লিখিয়া দিতে চাহিয়াছে—ইহার যৌক্তিকতা স্মরণ করিয়া উমাসুন্দরী সন্তুষ্টই হইলেন। প্রশান্ত স্বরে কহিলেন—কনককে বলে দিও, একটা বিলিতি দোকানে অর্ডার দিয়ে আসবে।

কনকের কথা মনে করিয়া সীতা ভাবিতেছিল,—বলে যে "আপনিই বলিয়া দিবেন।" কনক হয়ত বলিবে মাকে বলগে'—কি এই রকম একটা কিছু, উমাসুন্দরী বলিলে আর কোন কথাই হইতে পারিবে না। কিন্তু তখনি তাহার মনে পড়িয়া গেল—কেন নিজের এ স্বাধিকারটুকু সে ক্ষুণ্ণ করিবে? অধিকারের ভেদাভেদ আগে সীতার ছিল না, যে কারণেই হৌক, এখন জন্মিয়াছে এবং সতেরো বছরের বঙ্গ-বধুর নিকট এ গর্ব্ব নেহাৎ অল্প ছিল না। এই দূরতিক্রম্য গর্ব্বাধিকারটুকুর বলেই সে কনকের সম্ভাবিত প্রশ্নের কি উত্তর দিবে সেটি পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিল।

কনক ফিরিতেই সীতা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। কনক আজ

আর কোন প্রশ্ন করিল না, বলিল—আমি কালই তা'কে ধরে নিয়ে আসব—বুঝ্‌লে ?

সীতা ঘড়ি চেনের কথাটাও বলিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া গেল—কনক বলিল—বেশ কালই হ্যামিল্টনের বাড়ী যাব।

সতেরো বছরের নারী-চিত্ত আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিলেও, সীতা কনকের পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিল। সেটা তাহারই প্রাপ্য এবং লাভ—কাজেই সে সুখানুভব করিল।

কনকের কাছে হাত পাতিলে আজ বোধ করি সে নিঃস্ব হইয়া দান করিয়া ফেলিত। হয়ত জাহ্নবীর ব্যবহারটা বিরোধের মতই তাহার চিত্ত জ্বালা করিতেছিল, নয়ত তাহাকে পূর্ণানন্দ দান করিয়াছিল—এমনই একটা কিছু। কিন্তু নূতনত্বের আস্বাদ যে তাহাকে সচকিত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা সে সমস্ত পথটা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। সংসারে কর্ত্তব্য পরায়ণা বধুত্বের খোলসটা যে জাহ্নবীর মুখ হইতে হঠাৎ খসিয়া গিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে কৈশোরের অবাধ সারল্যের যে ছবিটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহার সহিত ছয় বৎসর পূর্ব্বেকার কনকের হৃদয়ের যোগ ছিল বলিয়াই আজ শয্যা প্রবেশ করিয়া কনকের মধ্যে স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিতেছিল।

হঠাৎ এক সময়ে কনক বলিয়া উঠিল—আমার যেতে রাত হ'য়েছিল বলে তারা কি রকম ব্যস্ত হ'য়েছিল জান ?

সীতা প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল—হ'বেই ত ! তোমার যেমন।

কনক বলিল—আমার দোষ কি বল। যে কারণে আমার দেরী হ'য়ে গেছে—ইত্যাদি।

যে কথাটা বলিবার জন্য সে ভূমিকা করিয়াছিল, তাহা বলা হইল না। অথচ বার বার মনে হইতেছিল—কথাটা সীতাকে বলিতেই হইবে! তখন দ্বিধা আর কর্ত্তব্য ভিন্ন মূর্ত্তিতে কনকের মনটিকে নাড়াচাড়া দিতে লাগিল।

ভাবিল—শুনিলে সীতা কিছু মনে করিয়া বসিবে না ত!

আবার ভাবিল—কি মনে করিবে! জাহ্নবী ত পর নয়।

ভাবিল—কিন্তু জাহ্নবী এল, দেখা করল না, জানাল না পর্য্যন্ত চুপি চুপি চলে গেল—এটা থেকে কিছু মনে করা যায় বই কি!

আবার ভাবিল—জাহ্নবী ত সেরকমটা করে নাই। সে ত আমিই করে ফেলেছি। দেরী হ'য়ে গেছে—এই অপরাধটাই তখন আমার কাছে বড় ছিল কিনা, অন্য কথা ভাবা হয় নি!

দ্বিধা হইল—সে যাই হোক, সীতা নিশ্চয়ই, না, না, নিশ্চয় বলা যায় না, তবে অন্যরূপ ভাবিতেও পারে।

কিন্তু কর্ত্তব্য জয়ী হইল। কনক বলিল—দেরী দেখে জাহ্নবী নিজেই গাড়ী নিয়ে হাজির!

সত্যি?

হ্যাঁ-গো। তারা ভেবেছিল—আমি হয়ত গেলুম না।

সীতা উত্তরে বলিল—আমি হ'লে খবর নিতুম না।

কনক বুঝিতে পারিল না, বলিল—কি বলছ?

সীতা স্বভাবতঃ মধুরস্বরে বলিল—আমি হ'লে হাঁড়ী তুলে শুয়ে পড়তুম। রাত দুপুরে খোঁজ করবার দায় পড়ে গেছে। ঠাকুরঝি অন্তরঙ্গ কি না।

কনক নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সীতা বলিল—সে দিন আমি ত যাব বলেই দিয়েছিলুম, তবু সে ছট্‌ফট্‌ করছিল—যদি না যাই।

কনক কথা কহিল না। কিন্তু অনেক কঠিন সমস্যার যে তরল মীমাংসা হইয়া গিয়াছে—তাহা সে অনুভব করিতেছিল।

সীতা কনকের হাত টানিয়া লইয়া বলিল—কি করে বল!

কথাটার মধ্যে যে গাঢ় বেদনা মিশ্রিত ছিল, তাহা কনকের হৃদয়েও আঘাত করিল। কিন্তু সে আঘাতকে স্থান দিবে না বলিয়াই সীতাকে বেষ্টন করিয়া বলিল—রাত হ'য়ে গেছে—শোও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তির বিপদ।

পৃথিবীতে এমন ঘটনা বিরল নহে যে শত অনিচ্ছা, প্রতিকূল যুক্তি থাকা স্বত্বেও মানুষ এক এক সময়ে এমন সঙ্কটে বসিয়া পড়ে—যে তাহার বিরুদ্ধে মুখটি খুলিবার যো ত থাকে না, তাহারই স্বপক্ষে কাজ তাহাকে করিতে হয়। চোরাবালির মধ্যে পা ঢুকিলে বিরুদ্ধতা করা যেমন মুর্খতা তেমনই বিপজ্জনক।

একদিন কনক ঠিক এই বিপদে পড়িয়াছিল, বলিতেছি।

নিশীথকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। হ্যামিলটনের বাড়ী হইতে

কনক কয়েকটি লকেট-চেন-শুদ্ধ ঘড়ি আনিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে একসেট সীতা পছন্দ করিয়া লইয়াছে—সীতা লকেটের সাদা কাগজটিতে স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছে—সীতা।

কনক আফিসে বাহির হইতেছে উমাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন—কনক, যাবার সময় জাহ্নবীকে বলে যাস্—আর ফেরবার সময় অমনি তাকে তুলে নিয়ে আসিস্।

কনক নতমুখে বাহির হইয়া গেল। একবার ভাবিল—মা'কে বলে যে সীতা চিঠি লিখিয়া তাহাকে জানাক্ কিম্বা তুমিই মধুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও—কিন্তু এই সকল পঙ্গু অজুহাতে তাহার নিজের মনই সায় দিল না। মা যদি বলিয়া বসেন—তোর ত ঐ পথ কনক—তখন সে কি বলিবে! বিলম্বের অছিলা খাটিবে না—সে পরের চাকর নয়, দু' দশ মিনিট বিলম্বের জন্য কাহারও উদ্ধত রক্ত চক্ষু শানাইয়া নাই—তবে কি অজুহাতে সে এ'টি কাটায়!

ভাবিতে ভাবিতে সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সহিসকে বলিয়া দিল—দিদিমণির বাড়ী!

একটু অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেই মনে হইল—হয়ত বৃথা সন্দেহ করিয়া মরিতেছি। জাহ্নবীর যে আচরণটা বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, সে'টা আর কিছুই নয়—সরল পরিহাস মাত্র। আবার তখনি মনে হইল, ছয় বৎসর পুর্ব্বে বিবাহের পরদিন বিদায়ের সময় জাহ্নবী ঠিক যেন এই রকমেরই একটা পরিহাস করিয়াছিল! কিন্তু সে ত পরিহাস নয়—সেই সময়ের হাসিটা যেন কান্নার সুরেই কনকের চিত্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। অথচ সে কি ক্ষুদ্র কথা!

একটু বেশী বয়সেই জাহ্নবীর বিবাহ হইয়াছিল, উমাসুন্দরী বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না,—সে সম্বন্ধে একখানি উপন্যাসেই তাঁহার মত প্রকাশ পাইয়াছিল।

বিদায়কালে বালিকা বধূর মত সে কাঁদে নাই। প্রশান্তমুখে সকলের কাছেই বিদায় আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছিল, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সে কনকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কয়েকবিন্দু অশ্রু আপনিই চোখের কোণে ফুটিয়া উঠিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়াই সে বলিল—কি আশীর্ব্বাদ করলে ?

কনক কি একটা বলিতে যাইতেছিল, জাহ্নবী হাসিবার মত মুখ করিয়া বলিয়াছিল—আর না ফিরি ! এই ত !

বুঝি—দুই বিন্দু অশ্রু যুবকের চোখের কোণেও টলমল করিয়াছিল—জাহ্নবী তাহা দেখিতে পায় নাই। কনক কোমরের তোয়ালে খুলিয়া হাত মুখ মুছিয়া ছুটিয়া কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল।

এ যেন একটা বায়স্কোপের ফিল্ম। সর্ সর্ করিয়া সরিয়া বৈদ্যুতী আলোকে ফুটিয়া চোখের সামনে লীলায়িত হইয়া উঠিল।

একমিনিটের ইণ্টারভ্যাল শেষেই আবার দেখিল—বিবাহের পর জাহ্নবী ফিরিয়া আসিল, তখন আর তাহার মুখে বা চোখে সেইদিনের পরিহাসের মত সেই ভাবটা নাই। দেখিয়া সে স্বস্তি বোধ করিয়াছিল। মানুষের মনের মধ্যে আশা ও নিরাশার এমন একটা স্থান আছে—যেখানটা মানুষের ইচ্ছামত আলোক বা অন্ধকারের ধার ধারে না। অনেক সময় সে অসম্ভব আশা করিয়াও বসে, আবার অনেক সময়ে অল্পেই নিরাশ বোধ করে ! কনক স্বস্তিবোধ করিলেও—সেই বিদায় দিনের দৃশ্যটি তাহার মনে

আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিল—তার পর কোনদিক হইতে কোন সাড়া না পাইয়া সেই আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ রেখাটি কখন শুকাইয়া গিয়াছিল—সেই রাত্রের আগে সে-কথা আর সে ভাবেই নাই।

সহিস পাদানের উপরের ছোট দরজাটি খুলিয়া দিতেই কনক নামিয়া পড়িল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল—জাহ্নবী!

জাহ্নবী স্নানঘরে ছিল, শুনিতে পাইল—জলের টব্‌টার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী কনককে প্রত্যুদগমন করিয়া বলিলেন—বৌ-মা স্নান করছে—তুমি একটু বসবে না?

কনক একটু জোরেই বলিল—হ্যাঁ বসব বৈ কি!

আবার বলিল—জাহ্নবীকে নিয়ে যাব আজ একবার, তাই বল্‌তে—মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী বলিলেন—বেশ ত বাবা। নিয়ে যাবে বৈ কি! প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি—তুমি রাজ-রাজ্যেশ্বর হও—তোমরা আছ বলেই হতভাগীর সাধ আহ্লাদ সব আছে।

কনক নতমস্তকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেই এই চিরন্তন সত্যটি যেন নবগন্ধে নব ছন্দে তাহার মনে বিকশিত হইয়া উঠিল। এ কথা ত কোন দিনই ভাবে নাই যে জাহ্নবীর সংসারে খুব বেশীমাত্রায় সুখ নাই এবং নিরবলম্বনীয় হইয়া সে থাকিবেই বা কেমন করিয়া? এই-টা না ভাবিয়াই সে কষ্ট পাইয়াছে—আজ এই বৃদ্ধার কথায় এক মুহূর্ত্তে তাহার মনটা দম্‌কা হাওয়ায় মেঘমুক্ত আকাশের মতই স্বচ্ছ হইয় গেল।

জাহ্নবী আসিতেই শ্বশ্রূ তাহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন। জাহ্নবী শান্তনেত্র তুলিয়া বলিল—কেন বল ত?

কনক বলিল।

শুনিয়া দৃষ্টিটা একটু ঘুরাইয়া জাহ্নবী বলিল—তাই বল! বৌ পাঠিয়েছে।

কনক সহাস্য আননে জবাব দিল—তাই! আমাকে তার দূত বলেই ধরে নাও।

জাহ্নবী বলিল—তবে দূত মহাশয়—

কনক চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল—যাবে না?

কেন যাব না? যাব বৈ কি! কখন যেতে হ'বে?

আমি দু'টো আড়াইটেয় ফিরব—

জাহ্নবী সাগ্রহে বলিল—সেই সময়েই যাব—তবে।

কনক তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—তাহ'লে আসব?

হ্যাঁ—বলিয়া জাহ্নবী চুপ করিল।

এখন আসি বলিয়া কনক উঠিয়া পড়িল। আজ আর কোনমতেই বিরুদ্ধ ভাবটিকে প্রশ্রয় দিল না। কোনদিন যে সে কথা ভাবিয়া অন্যায় করিয়াছিল, মনে পড়িতে লজ্জাবোধ করিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে সে জাহ্নবীকে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

আজ আর প্রগল্‌ভের মত কনক অনর্গল বকিয়া গেল না, নীরবে বসিয়া রহিল। কিন্তু এই মৌন নীরবতায় জাহ্নবী হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—কি, একেবারে চুপচাপ যে!

কনক হাসিল।

জাহ্নবী ও হাসিল। বলিল—কি ভাবছ—না এলেই ভাল হ'ত?

না—না। তা কেন?

নয়ত?—তাহ'লেই হ'ল—বলিয়া জাহ্নবী গাড়ীর বাহিরে চোখ্ রাখিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

---*---

বিপদ ঘনীভূত।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়াছে—এই কতক্ষণ নিশীথ চলিয়া গিয়াছে। সীতার মনখানি আজ বড়ই বিষন্ন। নিশীথের বিদ্যা, স্নেহ, পবিত্রতা শুচিতা সবগুলি মিলিয়া তাহার চিত্তে এমন একটি স্থান অধিকার করিয়াছিল যে আজ বহুদূর প্রবাসগমনের পূর্ব্বে তাহাকে বিদায় দিতে সে অন্তরে অত্যন্ত কাতরতা অনুভব করিতেছিল।

নিশীথ বিদায়কালে বলিয়াছিল—সীতা পাঁচ বছর পরে ফিরে এসে দেখ্‌ব কি জানিস? দেখব—তুই ঘোরতর সংসারি হ'য়ে পড়েছিস্। ছেলেপুলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একেবারে ষষ্ঠিবুড়ীটি হ'য়ে বসে আছিস্। না?

সীতা কোন উত্তর দিতে পারে নাই।

নিশীথ চলিয়া গেলে সে জাহ্নবীকে লইয়া আহারে বসিল। কথাবার্ত্তা কহিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল না। জাহ্নবীর প্রশ্নে দু'একটা জবাব দিতেছিল মাত্র। উমাসুন্দরী একধারে বসিয়া বিলাতগমনোন্মুখ ছেলেটির

অসামান্য পাণ্ডিত্যের, সারল্যের ও সর্ব্বাপেক্ষা তাহার বিনয়ের ভূয়সী প্রসংসা করিতেছিলেন—সীতা একমনে তাহাই শুনিতেছিল।

একসময় হঠাৎ জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—বৌ, উনি তোমার ভাই নন?

সীতা সচকিত হইয়া বলিল—কে বল্লে?

জাহ্নবী বলিল—না তাই জিজ্ঞাস করছি।

সীতা একমুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল—নিশীথ দা' আমার মা'র পেটের ভাই নন —

উমাসুন্দরী বলিলেন--নয়ই বা বলি কেমন করে? তোমার বাবা ত ও'কেও বিষয়ের ভাগ দিয়ে গেছেন।

সীতা বলিল—হাঁ।

উমাসুন্দরী বলিলেন—শুনেছি, তোমার ভায়েদের সঙ্গে পাছে কোনদিন বণিবণা না হয় সেইজন্য ওর জন্যে আলাদা বাড়ী করেও দিয়ে গেছেন।

সীতা চুপ করিয়া রহিল। জাহ্নবী বলিল—সম্পর্ক কিছু ছিল না?

উমাসুন্দরী জবাব দিলেন, বলিলেন—সম্পর্কের দরকার কি, জাহ্নবী!

সীতা জাহ্নবীর কথায় একটু ব্যথা অনুভব করিয়া ছিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। জাহ্নবী ত জানে না---তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছে--তাহাতে আর দোষ কি হইয়াছে---এই ভাবিয়া সে বলিল—তুমি ত আজ আর যাবে না ভাই?

জাহ্নবী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই উমাসুন্দরী বলিলেন—আমি ত কনককে বলে দিয়েছিলুম তোর শাশুড়ীকে বলতে যে থাকবি আজ—বলে নি?

জাহ্নবী মৃদুস্বরে কহিল—বলেছেন।

উমাসুন্দরী কহিলেন—এত রাত্রে কি আর যায়!

কনক বৈঠকখানা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—মা, গাড়ী ফিরে এসেছে। খুলে দিক্?

উমাসুন্দরী বলিলেন—দেবে বৈ-কি! সমস্তদিন খাটছে ঘোড়াটা। বৌমা, আমার কাছেই জাহ্নবীর একটা বিছানা করে দিও।

কনক চটিজুতার ফটাফট শব্দ করিয়া শুইতে গেল। জাহ্নবী বলিল—ভারি ত বিছানা, আমিই করে নেব—তুমি শোও গে বৌ।

সীতা বলিল—বিছানাটা করেই দিই।

জাহ্নবী বাধা দিয়া বলিল—না।

সীতা চলিয়া গেল।

রাত্রে উমাসুন্দরী জাহ্নবীর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন—বৌমা নিশীথকে একটা ঘড়ি-চেন উপহার দিয়েছে—দেখেছিস জাহ্নবী?

জাহ্নবী বলিল—না।

উমাসুন্দরী বলিতে লাগিলেন—বৌ-মা যখন সেটা পরিয়ে দিলে, আমি আড়ালে ছিলুম কি—না—শুনলুম, নিশীথ বল্লে—সীতা, যদি কখনও খেতে না পাই, ভিক্ষে করতে হয়, সেও ভাল, এ'টা তুমি যেখানে পরিয়ে দিলে—সেখান থেকে নামাব না। শুনে ছেলেটির ওপর আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

জাহ্নবী অন্ধকারের মধ্যে যেন আলেয়ার আলো দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, অস্পষ্টকণ্ঠে বলিল—মামী…

উমাসুন্দরী তাহার হাতটি টানিয়া লইয়া বলিলেন—কি মা জাহ্নবী?

জাহ্নবী বলিতে পারিল না। সে কথা বলা যে তাহার পক্ষে কি শক্ত

তাহা প্রথমটা সে বুঝিতে পারে নাই। সেই বিশ্বাস অবিশ্বাসে গড়া কথাটির চেয়ে তাহার নিজের মনে কতবড় একটা কথা সুগোপনে লুকাইয়া আছে জানিতে পারিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

উমাসুন্দরী কিছুই বলিলেন না।

হঠাৎ জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—মামী, শান্ত আমাকে ছেড়ে ত থাকতে পারে না। সে হয় ত বসে বসে কাঁদছে।

উমাসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন—সে কি আর কারো কাছে থাকে না?

না মামী। একবার যদি ঘুম ভাঙ্গল তার—আমাকে না দেখ্‌তে পেলে একেবারে জ্বলে যায়।

তাইত! কনককে ডাকব?

জাহ্নবী কোন উত্তর দিল না।

উমাসুন্দরী একটু ভাবিয়া বলিলেন—তারি বা দরকার কি! মধু গাড়ী ডেকে আনুক। এনে, সৌরভী আর সে যাক্—তোকে রেখে আসুক।

জাহ্নবী বলিল—না মামী, এত রাত্রে আমি আর কারু সঙ্গে যেতে পারব না!

উমাসুন্দরী বলিলেন—তবে যাক্ কনকই রেখে আসুক। সে যাবে কি! সমস্ত দিন খেটে খুটে আসে, ছেলে মানুষ!

তাঁহার মাতৃহৃদয় পুত্রের বিশ্রামটুকু নষ্ট করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল, কিন্তু জাহ্নবী যা বলিয়াছে তাহাও মিথ্যা নহে।

উঠিয়া বলিলেন—যাই ডাকি।

আমি ডাক্‌ছি—ততক্ষণ তুমি মধুকে একখানা গাড়ী আনতে পাঠিয়ে দাও।

কনকের দ্বারে করাঘাত করিতেই কনক উঠিয়া আসিল। দ্বারটি খুলিয়া বলিল—কে জাহ্নবী?

একমুহূর্ত্ত জাহ্নবী কথা কহিতে পারিল না। নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কনক জিজ্ঞাসিল—কি?

জাহ্নবী মুখ তুলিল, বলিল—ঘুমুচ্ছিলে?

না।—কি দরকার?

জাহ্নবী বলিল—আমাকে বাড়ী রেখে আসবে চল।

কনক বলিয়া উঠিল—এত রাত্রে! মত বদলাল কেন?

জাহ্নবী মৃদুস্বরে বলিল—আমাকে না দেখে আমার শান্ত থাকৃতে পারে না।

কনক মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—তোমার ছেলে, জাহ্নবী?

জাহ্নবীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল—হ্যাঁ—আমার ছেলে! জান-না?

কথাটার মধ্যে উষ্মা অনেকখানি ছিল, কিন্তু কনক নীলকণ্ঠের মত বিষটুকু পান করিয়া লইয়া বলিল—তবে চল। কিন্তু…

জাহ্নবী চোখ তুলিল। মৃদু আলোকপাতে সেই চোখ দু'টি যেন কনককে মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলিল। কথাটা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। আলনা হইতে গায়ের কাপড়টা টানিয়া বলিল—চল।

জাহ্নবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বৌ?

কনক দ্বারটি নিঃশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। পরে বলিল—অর্দ্ধেক রাত!

মধু একখানা চলতি গাড়ী পাইয়াছিল—গাড়ীতে উঠিয়া কনক সার্সিগুলি উঠাইতে উঠাইতে বলিল—বড় ঠাণ্ডা!

সীতার ভাগ্য

জাহ্নবীর ফিরিবার কথা ছিল না, সঙ্গে গরম বস্ত্রাদি কিছুই আনে নাই এ বাড়ীতেও মনে হয় নাই। কনক বলিল—তোমায় শীত করছে না ত জাহ্নবী?

জাহ্নবী বলিল—করলেই বা!

কনক বলিল—করলেই বা কেন! এস এদিকে—বলিয়া সে খপ করিয়া জাহ্নবীর হাতটা ধরিয়া টান দিল।

জাহ্নবী উঠিল না, বলিল—থাক্—

কনক টানিতে টানিতে নিজের পার্শ্বে আনিয়া বসাইয়া শালখানি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিল—এত স্বার্থপর আমি বুঝি?

জাহ্নবী রুদ্ধশ্বাসে বলিল—না, মস্ত ত্যাগী তুমি!

কনক বলিল—তা'ত না—এই দেখ। সবটাই তোমাকে দিই নি।

জাহ্নবী তাহা পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু কনকের মুখে সে কথা শুনিয়া যেন কি রকম একটা মনে হইল তথনই সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—আমি জানতুম তুমি মস্ত ত্যাগী। তাও না—তবে কি?

মানুষ—বলিয়া কনক শালটি দিয়া নিজেকে আবৃত করিয়া বসিল।

তাও না—বলিয়া জাহ্নবী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

হয় কনক সে কথা শুনিতে পায় নাই, অন্যমনস্ক ছিল—নয়ত ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিল না।

অল্পক্ষণ পরে জাহ্নবী বলিল—ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত পড়েছিলে, সব মনে আছে?

কনক বলিল—নাঃ! এমন মনই আমার নয়।

ভুলে গেলে?

কি জানি—হয়ত-একটু আধটু মনে আছে।

জাহ্নবী পরিহাসের মত স্বরে বলিল—মহারাজা নল বনবাসে···.

কনক বলিল—গেছলেন। সস্ত্রীক।

জাহ্নবী বলিল—এক বসন দু'জনে···

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে! কিন্তু সে কথা কেন! ওহ! কি বলছ—জাহ্নবী!—বলিয়া সে জাহ্নবীর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল।

জাহ্নবী নড়িল না, আপত্তি করিল না। কবির ভাষায় বলিতে গেলে সে বোধ করি সে সময় তাহার ভিতরে ছিল না। কিন্তু—সেই মুহূর্ত্তে সেই স্পর্শটা সজীব সচেতন হইয়া তাহাকে আনন্দের চাপের মত চাপিয়া ধরিয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

হৃদয়-দ্বন্দ্ব।

জাহ্নবী সেই গিয়াছে—আর আসে নাই। সেই রাত্রের শালের ব্যাপারটা কত রকমেই কতবার কনকের মনে হইয়াছে। সে-যে কেবলমাত্র একটা পরিহাস—স্নেহের রহস্য তাহাও সে ভাবিয়াছে, কিন্তু সে যত বড় পরিহাসই হোক, তাহার সঙ্গে যে একটা নিবিড় মাধুর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে তাহাকে আবেশময় করিয়া তুলিয়াছিল—তাহাও সে বুঝিয়াছে।

রোজই আফিস হইতে ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিত—আজ গিয়া শুনিবে জাহ্নবী আসিয়াছিল- সীতা তাহার গল্পই করিবে! কিন্তু সীতা না তুলিত তাহার কথা, না দিত তাহার আগমন সংবাদ। অথচ সে কোনমতেই এই সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করিতে পারিত না।

জাহ্নবী যে আসে নাই ইহা কনক বুঝিতে পারিত। তাহার আগমনটা এ বাড়ীর সকলের কাছেই প্রীতিপ্রদ ছিল বলিয়াই সে নিশ্চিত জানিত কেহই গোপন করিবে না। উমাসুন্দরী অথবা সীতা যে কেহ বলিতই।

কিন্তু সে জানিত না যে, সীতার না বলিবার একটু কারণ হইয়াছিল। সেই রাত্রে কনক জাহ্নবীকে লইয়া চলিয়া গেলে, হঠাৎ সীতার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। নিশীথের বিদায় শোকটা প্রবল ছিল বলিয়াই হৌক, অথবা অন্য কারণেই হৌক নিদ্রার মধ্যেও সে-যেন শান্তি পাইতেছিল না। ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল—স্বামী নাই! ধক্ করিয়া বুকটা যেন লাফাইয়া উঠিল। সংলগ্ন-স্নানঘরে ঢুকিয়া দেখিল, সেখানেও নাই। জাহাজের সার্চ লাইটটা যেমন সামনে পড়িতেই ছোটখাট নৌকাগুলি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে—সীতার মনোরথের রশ্মিটা তেমনি একেবারে জাহ্নবীর উপরে গিয়াই পড়িল।

সে ভাবিল—নিশ্চয়ই কনক ও-ঘরে জাহ্নবীর কাছে গিয়াছে। মা'ও আছেন—গল্প চলিতেছে। কনকের উপর যে একটু রাগ [illegible] হইল তাহা নহে।

কিন্তু মা'র ঘরেও কনক ছিল না। যদিও সীতা নিঃশব্দে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই উমাসুন্দরী জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—কে-রে, কনক?

সীতা কোন উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, পাশের ঘর হইতে সৌরভী বাহির হইয়া বলিল—কে গা, বৌমা! বাবু ত এখনও ফেরেন নি।

সীতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসিল—কোথায় গেছেন ?

সৌরভী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কহিল—ওমা ! সে কি গো ! তোমাকে বলে যান্ নি বুঝি ? সে আবার কি-গো !

উমাসুন্দরী ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন- আ-মর ! এত হাঁক ডাক কচ্ছিস কেন ! তোর কি সব বিট্‌কেল !

একটু থামিয়া বলিলেন—সৌরভী । যা, তুই ততক্ষণ বৌমার কাছে বস্‌গে যা ।

সৌরভী বলিল—চল, বৌমা ঘরে চল ।—সে রাগে গর গর করিতেছিল ।

ঘরে ঢুকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল—তোমাকে বাবু কিছু বলে যান্ নি বৌমা ?

সীতা কথা কহিল না । একবার তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লয় ! কিন্তু সৌরভীর বিস্ময়াতিশয্যে তাহার নিজেরই এমন লজ্জা হইতেছিল যে সে সৌরভীর মুখের পানেও চাহিতে পারিল না । গায়ের লেপ্‌টা টানিয়া ঢিপ্ করিয়া শুইয়া পড়িল ।

সৌরভী বহুদিন-গত অতীত জীবনেতিহাসের পাতা কয়টি উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—নজ্জায় মরি, মা, নজ্জায় মরি । তোমার কাছ থেকে উঠে গেল, তুমি এমন ঘুমুলে মা—যে কিছু জানতে পারলে না ।

সীতা সাড়া দিল না, কিন্তু সৌরভীর তাহাতে আসিয়া গেল না । সে অঞ্চল টানিয়া বিস্তৃত পা দু'খানি আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল—বড় লোকের বড় কথা বৌমা । অম্নি ঘুম যদি আমরা ঘুমুতুম, বাছা, রক্ষে থাক্‌ত না । তা বৌমা, বলি ঘুমুলে কি ?

সীতাকে নিরুত্তর দেখিয়া আবার বলিল—আহা তা ঘুমোও, ঘুমোও । পোয়াতী মানুষ 'আকেলান্ত' শরীর—ঘুমোও । বাবু-ও যে এলে বাঁচি

আমি—চোখ দু'টো যেন ঘুমে কেমড়ে ধরেছে। গাড়ীতে যাবে, গাড়ীতে আস্‌বে—এত দেরী কল্লা কেন বাপু?

সীতা বলিল—সৌরভী, তুই যা, নইলে আমার ঘুম হ'বে না।

সৌরভী অন্যরূপ বুঝিল, বলিল—তা-কি আবার হয়! একজন কাছে থাক্‌লে কথা কইতেই ইচ্ছে হয়। এই দেখ না বৌমা, আমার চোখ দু'টো বুজে আস্‌ছে, তবু তুমি আছ বলে দু'টো কথা কইতে হচ্ছে।

সীতা উঠিয়া বসিয়া বলিল—ব্যগ্রতা করি সৌরভী—তুই যা। তোর দু'টো কথার জ্বালায় আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি।

ওমা—কথা না কইলেই ত মোদের পেরাণ হাঁপে ওঠে। এযে—

সীতা বলিল—তুই যাবি কি-না?

সৌরভী উঠিয়া পড়িল। সে-যে সীতার 'ভালর' জন্যই 'করিতেছিল'—সে যখন বুঝিল না, তখন কি আর করিবে? জগতে যে কাহারো ভাল করিতে নাই, তাহাতে গঞ্জনা আছে—কৃপাসূচকস্বরে তাহাই প্রচার করিতে করিতে সৌরভী একটি হাই তুলিয়া, দুইটি তুড়ি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অবিশ্বাসের কথাটা না-হয় নাই ধরিলাম! কিন্তু এত রাত্রে দু'টিতে যাওয়ার কি বিশেষ দরকার ছিল? সে-ত থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছিল এবং কিছুক্ষণ আগেও সেই মতই বজায় ছিল, হঠাৎ কখন্ চুপি চুপি যাইবার প্রয়োজন হইয়া উঠিল!

সীতা বুঝিয়াছিল, উমাসুন্দরী ঘটনাটি সবই জানেন। কিন্তু ইহাতে তাহার ক্ষোভ দূর হইল না! স্বামী—যিনি তাহারই কাছে পরম নিশ্চিন্ত মনে শুইয়াছিলেন, তাহাকে একটি কথামাত্র না বলিয়া তিনি যে অন্য এক

রমণীর সহিত চলিয়া গিয়াছেন, ইহাকে সে কোনমতেই লঘু করিয়া ভাবিতে পারিল না।

যাইবার হয়ত বিশেষ দরকারই হইয়াছিল এবং তাহার স্বামী ছাড়া নির্ভর করিবার মত কেহই ছিল না, এ সকলই সত্য হইতে পারে—কিন্তু ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় যে, তিনি তাহাকে না জাগাইয়া, না একটা কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাকে যদি সে উপেক্ষা মনে করে সে কি নিতান্তই অন্যায়!

যে ভাব কোনদিনই কোন বয়সের মেয়ের কাছেই সুখপ্রদ ও গৌরবের নয়, সে-যে সকল অবস্থাতেই দুর্ব্বহ ও নির্ম্মম—ইহার কবল হইতে ত সেই সতেরো বছরের বধুটি নিস্তার পাইল না।

ঘটনাটা এইখানে থামিয়া গেলেই যে সবদিকে ভাল হইত এবং যাওয়াই ছিল উচিৎ—তাহা সীতাও জানিত। কিন্তু যা ঘটিল, সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

স্বামী নিঃশব্দে আসিয়া বিছানায় ঢুকিলেন। সে-যে জাগিয়াছিল বা তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া চক্ষের দীপ্ত দৃষ্টিকে বদ্ধ করিয়া একটি আহ্বান বা একটি কথার জন্য সমস্ত হৃদয়কে কানের নীচেই একীভূত করিয়াছিল, তাহা কনক জানিল না। সে বিছানায় ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। শীতের দীর্ঘ রজনীর মধ্যে একটিবারও তাহাদের বাক্যালাপ হইল না।

সকালে যখন সীতা উঠিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল—তাহার মুখে চোখে যে একটা কালীর ছোপ পড়িয়া গিয়াছে এবং সে-যে কোনমতেই সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে না—উমাসুন্দরীর দৃষ্টিতে সেটুকু লাগিয়াছিল। রাত্রে সীতা কনককে খুঁজিয়াছিল, এ'টা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,

এবং সে-যে কিরূপ ভীষণ ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি বিবরণও তিনি সৌরভীর নিকট পাইয়াছিলেন।

উমাসুন্দরী জিজ্ঞাসিলেন—হ্যাঁ বৌমা, রাত্রে কি ঘুম হয় নি ?

সীতা একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল—না।

সে-যে সত্য বলিয়াছে এবং চেষ্টা করিলে একটা মিথ্যা বলিতে পারিত, নারীহৃদয়ের এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে সে যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক, উমাসুন্দরী ঠিক সেই পরিমাণেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তবে ত সৌরভী ঠিকই বলেছে—এ সব বাড়াবাড়ি নয় ?

কোন্‌টা বাড়াবাড়ি—রাত্রে উহাদের যাওয়াটাই বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়া সে-কি বলিতে যাইতেছিল, উমাসুন্দরী গম্ভীরভাবে বলিলেন—বাঙ্গালীর ঘরে যে আজকাল কথায় কথায় লোকে ভাগ ভেন্ন হয় মূলে তার এই। হ্যাঁগা বৌমা, কনক ত আমারই কথায় গেছে—আর তুমি বাছা তখন হয়ত ঘুমুচ্ছিলে, ডেকে যে তোমারই হুকুম নিয়ে যেতে হ'বে—আমার ছেলে সে'টা জান্ত না।

সীতা নিষ্পন্দম্লানমুখে আঘাত সহ্য করিয়া লইল, কিন্তু ইহা একটা খোঁচার মতই তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল যে কনকের এই কাজটা স্বেচ্ছাকৃত ত নহেই বরঞ্চ তাহাকেই ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে অন্যলোকে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু রাগটা তাহার সব চেয়ে বেশী হইল, কনকের উপর! সে কেন বলিয়া গেল না! অন্যে যাহাই বলুক, করুক—সে ত তাহার কর্ত্তব্য জানে!

এতদিন তাহার ধারণা ছিল—কনক নিরপেক্ষ ও উদাসীন। দুঃখ থাকিলেও ব্যথা ছিল না, কিন্তু যখনই সে বুঝিল—সে নিরপেক্ষ ত নহেই,

অধিকন্তু এমন স্থান আছে যেখানে সে অত্যন্ত সতর্ক—তখন আর তাহার ব্যথার সীমা পরিসীমা রহিল না। সেই ব্যথাটাই পুঞ্জীভূত মেঘের মত হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত সন্তরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহারই নিষ্করুণ পদভারে তাহার সমস্ত স্ত্রী-হৃদয়খানা মথিত হইতে লাগিল।

কনকের নিরাশক্ত নীরবতার তলে যে এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে সে তাহা জানিত না। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও সে মুক্তকণ্ঠে সীতার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিত। সীতা ঘুমাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়াই কনক এই সকলের প্রয়োজনীয়তা বুঝে নাই! নহিলে সে যে জাহ্নবীকে রাখিতে গিয়াছিল—এ কথা বলিবার পক্ষে এতটুকু বাধাও তাহার ছিল না।

তবে হাঁ জাহ্নবী যে আর আসে না, এ প্রশ্নটা নিজের মনে বারবার উঠিতেছিল বলিয়াই সে এই আগ্রহাতিশয্যকে প্রশ্রয় দিবে না বলিয়াই কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন একটা দিন শীঘ্রই আসিয়া পড়িল যেদিন সীতা তাহার হৃদয়নিবদ্ধ সমস্ত উত্তাপ সযত্নে শীতল করিয়া ফেলিল। সমস্ত ব্যথা, বেদনা মুছিয়া ফেলিয়া সে প্রশান্তমুখেই সকলের সম্মুখীন হইল।

কনক সস্নেহে তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—যে হ'য়ে অবধি বেশী দিন আমরা তফাৎ থাকি নি, সীতা!

সীতা চোখের জল মুছিয়া বলিল—তুমি যাবে ত?

কনক তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—সীতা ছ'মাস প্রায়—আমি থাকব কেমন করে? তুমি যেও না সীতা, এখানেই থাক—যা হ'বার এখানেই হো'ক।

সীতার ভাগ্য

যে বিধাতা নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কি ছিল, তিনিই বলিতে পারেন, কিন্তু এই সময়টা নারীজীবনের এমন একটা সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত—যে সে সময় দোটানা স্রোতের মধ্যে তাহার অন্তরটার একেবারে টানাহেঁচড়া পড়িয়া যায়। একদিকে পিতৃগৃহের আজন্ম-আত্মীয়বর্গের নিরাপদ যত্নের আকর্ষণ, অন্যদিকে স্বামী।

সীতা কম্পিতস্বরে বলিল—তুমি যাবে।

একটু থামিয়া আবার বলিল—নইলে আমি থাকতে পারব না।

কনক এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—কাল এসময়ে এঘরে আমাকে একলা থাকতে হ'বে।—সে আর কিছুই বলিল না। কিন্তু এই কথাটাই সীতার মনে ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল।

কনক বলিল—কাল থেকে, ওঃ—কতদিন!

সীতা আঁচলটা মুখে চাপা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মধ্যে কয়দিন সে ইচ্ছা করিয়াই কনককে অশান্তির মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সেই অনুশোচনায় তাহার মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

কনক কথা কহিল না। সীতা সজল দৃষ্টিটা তুলিয়া কনকের ব্যথাক্ষুব্ধ শুষ্ক মুখখানি দেখিতেই তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তুমি মাকে বল'।

কনক মুখ তুলিল।

কে?

'আমি' বলিয়া জাহ্নবী পর্দ্দাটা সরাইল, ভিতরে ঢুকিল না। কনক বলিয়া উঠিল—জাহ্নবী!

জাহ্নবী ঢুকিয়া বলিল—কি?

কনক বলিল—তুমি বল্‌বে জাহ্নবী মাকে যে.........

সীতা বিষণ্ণ ভারানত চোখ দু'টি তুলিয়া চাহিতেই কনক থামিয়া গেল। সে বুঝিল, এই দাম্পত্য দুঃখে তাহারা দু'টি ছাড়া আর কাহারো কাছে সহানুভূতি সে চায় না।

জাহ্নবী একমিনিট চাহিয়া থাকিয়া যেন কনককে মুক্তি দিতে বলিল—আফিস বেরও নি যে!

কনক 'না' বলিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

জাহ্নবী বলিল—আমি এসে ত তাহলে বড় অন্যায় করেছি।

সীতা আস্তে আস্তে সরিয়া আসিয়া সজলমুখে বলিল—কি অন্যায়! কিছু নয়, এস।

জাহ্নবীর মুখ দেখিয়া বুঝা গেল, সে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে বলিল—তোমার কাছে না-হয় অন্যায় না হ'ল কিন্তু—আরেকজনের হয়ত—

সীতা তাহার হাত ধরিয়া ছিল, ছাড়িয়া দিয়া বলিল—কি জানি!

জাহ্নবী নির্ব্বাকবিস্ময়ে একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—দাঁড়াও। আসচি।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

সীতার বনবাস।

কনক দ্বিতলে বৈঠকখানায় বসিয়া কি একখানা কেতাব দেখিতেছিল, জাহ্নবী ঢুকিতেই সেখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল—কি?

জাহ্নবী চমকিত হইয়া বলিল—তোমাকে ডাক্‌ছে।

অন্যসময় হইলে কনক হয়ত হাসিয়া জিজ্ঞাসিত—কে ডাক্‌ছে।—এখন সীতার বিদায় বেদনাটি তাহার মধ্যে ঘনীভূত হইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। জাহ্নবী পাঁচসাত-মিনিট টেবিলটার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনের অবস্থা যে সুস্থ ছিল না—তাহা তাহার মুখের উদ্বিগ্নতায়, সেই চোখ দু'টির নিস্তেজ দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছিল।

ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল যে তখনকার মনের তাহার যে অবস্থা তাহা কোনদিনই তাহার জ্ঞাত ছিল না এবং অনেক যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া তাহাকে বিধেয় বলিয়া সে মানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু এই মানিয়া লওয়া-না-লওয়া যুক্তিতর্কের কথা, যুক্তিতর্কছাড়া মানুষের মনের মধ্যে এমনও কতকগুলি জিনিষ আছে—যে গুলি কখনই তাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। অবিধি বলিয়া যেটাকে মানুষ চাপা দিবার চেষ্টা করে, কখন কোন্ সময়ে যে সেইটাই বিধিমতে হৃদয়ে নিজের স্থান সংগ্রহ করিয়া লয়—তাহা অনেক সময়ে সুদূর কল্পনাতেও উদিত হয় না।

জাহ্নবীর চোখ্-দু'টিতে যে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেওয়ালে টাঙ্গানো সুবৃহৎ মুকুরে নিজের চোখেই অশোভন বলিয়া বোধ হইতেই সে একেবারে উমাসুন্দরীর কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। উমাসুন্দরী লোহার আলমারী খুলিয়া সীতার অলঙ্কার বাহির করিতেছিলেন। জাহ্নবী কাছে আসিয়া বসিল, তিনি কথা কহিলেন না। জাহ্নবী বলিল—মামী, এসব বৌ-র ?

এই অনাবশ্যক প্রশ্নে উমাসুন্দরী একটু বিরক্তই হইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে বা ভাবে সে-রকম কিছুই প্রকাশ পাইল না।

জাহ্নবী বলিল—মামী, বৌ ত আর দিনকত থাকলেই পারত !

এ কথা উমাসুন্দরীও ভাবিতেছিলেন। কেন ভাবিতেছিলেন—কে জানে ! বলিলেন—তা ত হয় না বাছা। আর ত গাড়ী চড়তে নেই।

আবার কি ভাবিয়া বলিলেন—অবশ্য বৌ-মা যদি ইচ্ছে না করে'……

জাহ্নবী কথা কহিল না। উমাসুন্দরীও কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। আমরা জানি সে সময় তিনি এক বিষম হৃদয় দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। যদি বাস্তবিকই সীতা আসিয়া বলিত যে সে এখন যাইবে না, তিনি কি-যে উত্তর দিতেন, বলা যায় না। ইহাতে হয়ত পুত্র সুখী হইবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মা হইয়া তাহাতেও সম্মত হওয়া সোজা নয় ত ! এ সময়ে যে সীতার পিত্রালয়ে থাকা কত মঙ্গলকর তাহা আর কেহ না জানুক উমাসুন্দরী জানিতেন—তাই কথাটা বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

মখমল-মোড়া বাক্সগুলি খুলিয়া দেখিতে দেখিতে জাহ্নবী বলিল—মামী, এসব গহনা বৌ-র বাপের বাড়ীর, না ?

হ্যাঁ।

আর এখানকার গুলো ?

উমাসুন্দরী আলমারিটি বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন—বৌ-মার গায়েই ত সব আছে।

এমন আড়ম্বর শূন্য নিস্তেজ ব্যবহার সে কোন দিনই এখানে পায় নাই,—আজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও মুখে তাহার ক্ষুদ্র লক্ষণও প্রকাশ পাইতে দিল না,—বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই জাহ্নবী ঘাড় নাড়িয়া সস্মিতমুখে বলিল—ওমা ! এত সব গহনা মানুষ বাড়ীতে পরে' থাকে ?

উমাসুন্দরী বলিলেন—সবাই থাকে না ! যা'র দু'সেট চার সেট আছে সে পরে' থাকে।

জাহ্নবী কি বলিবার জন্য হাঁ করিয়াছিল, উমাসুন্দরী তাহার ব্যথিত দৃষ্টি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—কথাটা ঠিক তা নয়, জাহ্নবী। বৌ-মা যে জড়োয়া গহনা গুলি সব পরে থাকে, তা আমারও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ছেলেমানুষ, পরবার এই সময়ও বটে—আর 'না' বল্লে পাছে দুঃখ করে—আমি বারণ করিনি। ছেলেমানুষ, ভাবাটা ত আশ্চর্য্য নয়।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন—যখন আমি বই লিখ্‌তুম, মানুষের মনের বিশ্লেষণ করাই ছিল আমার কাজ ! মানুষ যতই গোপন করুক, মনের কথাটি তার দেবতার বরে অন্তর্য্যামীর মত উপন্যাস্ লেখকেরা ধরে ফেলে। তা'দের কাছে গোপন করবার মানুষের কিছু নেই, সে যো'টিও থাকে না।—বলিয়া তিনি মুখটি ম্লান করিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রথমে জাহ্নবী তাঁহার হৃদয়ের স্বচ্ছতায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক-দিন যেমন জাহ্নবীর ধারণা ছিল যে-কারণেই হোক, সীতার প্রতি তিনি বিমুখ—আজ তেমনি সে বুঝিল, তাহা ত নয়ই বরং সেই হৃদয়টি যে

একেবারে সদ্য পরিষ্কৃত কাঁচখণ্ডের মতই স্বচ্ছ—তাহাও সে নিশ্চিত জানিতে পারিল। কিন্তু কথার শেষটা শুনিয়াই সে-যেন আহত হইয়া পড়িল।

তবে কি তিনি তাহার মনের গোপন কথাটিও দেবতার বরেই জানিয়াছেন? ভূত দেখিলে মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া যায়, ভিতরে-বাহিরে অজ্ঞান কি সজ্ঞান সে নিজেই বুঝিতে পারে না—জাহ্নবীর অবস্থাটাও ঠিক সেই রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বুকের ভিতর হইতে কি একটা পিণ্ডাকারে ঠেলিয়া উঠিয়া যে তাহার গলাটা রুদ্ধ করিয়া দিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু সেই অশক্ত পা দু'টা, ততোধিক অশক্ত দেহটাকে নাড়িয়া সে কোনমতেই উঠিতে পারিল না।

এমন ভাবে আর কিছুক্ষণ থাকিলে কি হইত বলা যায় না, ঠিক এই সময়ে সীতা ঘরে ঢুকিতেই উমাসুন্দরী বলিলেন—এস-মা, একখানা পরিয়ে দিই।

অলঙ্কার কয়খানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া স্নেহভরে সীতার চিবুক ধরিয়া তুলিতেই সীতার ভিতরে যে জলোচ্ছ্বাস এতক্ষণ নির্গমনের নিষ্ফল-প্রয়াসে নিবদ্ধ ছিল, এখন একেবারে বাঁধভাঙা স্রোতের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সীতা শ্বশ্রূর বক্ষের উপর মুখ রাখিয়া শুধুই কাঁদিল।

কেন মা, বাপের বাড়ী যাচ্ছ—আবার চাঁদের মত ছেলে নিয়ে আসবে—এমন অনেক সহজ কথা উমাসুন্দরীর মনেও জাগিয়াছিল, কিন্তু অশ্রুভার-নিপীড়িত এই কিশোরী বধূটির শোকের প্রচণ্ডতায় কিছুই কহিতে পারিলেন না। দুইহাতে তাহার মুখখানি আঁচলে মুছাইতে লাগিলেন।

সীতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি লইয়া উঠিতেই উমাসুন্দরী বলিলেন—বৌমা, তোমাকে যে কোনদিন কম ভালবেসেছি—একথা কখনই মনে কর না-মা—আরও বলিবার ছিল, বলা হইল না। বারেকমাত্র

জাহ্নবীর অসাড় মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বাহিরের বারান্দায় কেহ ছিল না—সীতার-অশ্রুজলসিক্ত নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ দু'টি মুছিয়া ফেলিলেন।

সীতা বাহির হইয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া ফিরিল। জাহ্নবীর পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল—ঠাকুরঝি!

জাহ্নবী মুখ তুলিল। তাহার চোখে সে কি দেখিল, বলা যায় না, এক মিনিট থামিয়া বলিল—চল্লুম বনবাসে, ঠাকুরঝি।

আর একটা কথাও বলিল না। পাছে তাহার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কথা তাহার ঠোঁটের বাহিরে আসিয়া পড়ে, সীতা কম্পিত অধরোষ্ঠ চাপিয়া বাহির হইয়া গেল।

জাহ্নবী উঠিল না। হৃদয়ের যেদিক্‌টা সব চেয়ে বেশী অন্ধকার ছিল, একবার একটি দেশলাই-কাঠির আলোকে সেই দিকটা ধীরে ধীরে আলোকিত হইয়া উঠিল, এবং আলোকের পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গেই—সেই চিরান্ধকারের মধ্যে পড়িয়া সে মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

তাহার মনে হইতেছিল—পাতাল হইতে কোন্ একটা অদৃশ্য মহাশক্তি তাহাকে ক্রমশঃই টানিয়া প্রোথিত করিয়া দিতেছে।

বাহিরে কাহার পদশব্দে জাহ্নবীর অন্তঃস্থল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল—তাড়াতাড়ি সে উঠিতে যাইবে, কনক একেবারে তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল— চলে গেল,—জাহ্নবী!

জাহ্নবী আরক্তনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এমন স্বর জীবন-ভোর সে শুনে নাই—এ-কি তাহার কণ্ঠ—না জলোচ্ছ্বাস—ভাবিতে ভাবিতে সে মুখটি নামাইয়া লইল।

কনক ছল ছল চোখে, ততোধিক কম্পিত হস্তে জাহ্নবীর হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মুখ নামিও না জাহ্নবী!

জাহ্নবী আহত শার্দ্দূলের মত মুখ তুলিতেই কনক তীব্র করুণ স্বরে বলিল—অন্ততঃ তুমি বল—যাক্!

প্রবল বাতাস যেমন আগুণের ফুলকী উড়াইয়া লইয়া যায়, জাহ্নবী কনকের প্রসারিত হাত দু'টি ঠেলিয়া আপনাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০*০—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

'মাণিক এসেছে।'

জাহ্নবী সেদিন এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই ফিরিয়াছিল যে আর সে কোন দিনই উমাসুন্দরীর সম্মুখীন হইতে পারিবে না। তিনি যে উপন্যাস লেখার শক্তিবলে তাহার অন্তরের নিভৃততম দুর্গম স্থানটিরও পরিচয় পাইয়াছেন—ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধের মতই সে বুঝিয়াছিল। উমাসুন্দরীর কথাটির মধ্যে এমন আভাষ ছিল না বটে, কিন্তু জাহ্নবীর মন যেন সে ইঙ্গিতটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার কতকগুলি কারণও হইয়াছিল। সে দিন উমাসুন্দরী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহে জাহ্নবীকে আদর অভ্যর্থনা করেন নাই। জাহ্নবী ত ভাবিলেই পারিত যে একমাত্র পুত্রবধুটির বিয়োগব্যথা তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সেই উপন্যাস লেখকের শক্তিটা তাহাকে আগে হইতেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই এই সহজ সত্যের দিক দিয়াও সে গেল না।

নিজের মনে সে-গৃহের দ্বার রুদ্ধ ভাবিতেই তাহার হৃদয়-মন একেবারে হাহাকার করিয়া উঠিল। যে গৃহ আজন্ম তাহাকে স্বাগতঃ সম্ভাষণ করিয়া লইয়াছে—তাহা যে কোন কারণেই প্রবেশ রোধ করিতে পারিবে, ইহা মানাও বড় সহজ নহে। শুধু কি তাই! সেই গৃহের ইট কাঠ পর্য্যন্ত যে তাহার আপনার। যে গৃহে তাহার অতীতের কত লুপ্তপ্রায় সুখ-দুঃখের, সুখ-অসুখের, পাওয়া এবং না পাওয়ার স্মৃতিগুলি গলিয়া ঢলিয়া চুণ সুরকীর মত মিশিয়া আছে—তাহা সে ছাড়িবে কি করিয়া। সে কি মানুষে পারে? না এত বড় সহ্য হৃদয়েরই আছে!

আছে।—সেই দিনই তাহাকে বুঝিতে হইল, রেলের এঞ্জিনের মত অত্যধিক বাষ্প সঞ্চয় হইলেও হৃদয় তাহার এমনি ধাতুতে তৈরী যে লৌহ অপেক্ষাও সে ফাটিতে চায় না। মানুষের কলে ঢালা এঞ্জিন ফাটে, মানুষের সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট এঞ্জিন ফাটে না। ইহাই বিশেষত্ব।

জাহ্নবী বাড়ীতে পা দিতেই শ্বশ্রূ মৃদুস্বরে বলিলেন—মা, মাণিক এসেছে, তোমার ঘরে শুয়ে আছে।

আমরা শুনিয়াছি পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা নাকি আছে, যেখানে পা দিলে নিমিষে মানুষ বরফ হইয়া যায়।

শ্বশ্রূ জাহ্নবীর মনের অবস্থাটা বুঝিয়াই বলিলেন—মাণিকের শরীর ভাল নয়—চিকিৎসা-পত্র করতে হ'বে।

জাহ্নবী কথা কহিল না। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে উপরে উঠিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে বাহির হইতে উঁকি মারিয়া একবার দেখিয়া আসে! কিন্তু বাহিরে তাহার পদশব্দের উদ্দেশেই মাণিকলাল বলিয়া উঠিল—কে?

জাহ্নবী দুই পা পিছাইয়া আসিয়াছিল, আবার কি ভাবিয়া অগ্রসর হইয়া ভিতরে ঢুকিল।

মাণিকলাল শুইয়াছিল। বলিয়া উঠিল—এই যে প্রাণ-প্রেয়সী, দেখন-হাসি!—বলিয়াই সে একটু হাসিবার ভাণ করিল।

কিন্তু এক মুহূর্ত্তে জাহ্নবীর হৃদয় মন একেবারে ডিঙ্গী মারিয়া উঠিল।

মাণিকলাল আগ্রহাতিশয্যে হাত পা নাড়িয়া বোধ করি তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিতেছিল, 'বাপ' বলিয়া যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শুইয়া পড়িল। জাহ্নবীর দৃষ্টিটাও পড়িল, ঠিক তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা-টায়!

বলিল—পায়ে কি হ'য়েছে?

মাণিকলাল কাতরভাবে বলিল—যা হ'বার—তাই—আর কি!

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাণিকলাল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা'টা একটা তাকিয়ার উপর রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, বেদনাধিক্য বশতঃ পারিল না। অস্ফুট চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িল। জাহ্নবী তাহা দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল—তুলে দেব?

মাণিকলাল বলিল—দেবে—দাও।

জাহ্নবী পা'টা তুলিয়া দিয়া আবার সরিয়া আসিল।

কি ভাবছ, জাহ্নবী?

সুষুপ্ত অশ্বকে কশাঘাত করিলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, জাহ্নবীও তেমনি চমকিয়া উঠিল, কথা কহিল না।

মাণিকলাল পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাইয়া একটু হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু বলে দিতে পারি কি ভাবছ? বলব?

জাহ্নবী সাড়া দিল না।

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল—কাজ নেই বলে। তুমি রাগ করবে।

জাহ্নবী বলিল—না। বলুন।

'বলুন' কথাটা মাণিকলাল লক্ষ্য করিল। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বলিল—দেখ'—রাগ কর' না শুনে।

জাহ্নবী নতমুখে কহিল—না ?

মাণিকলাল বলিল—তুমি ভাবছ এই মাতালটা—যার সঙ্গে ছ'বছরের মধ্যে দেখাশুনাও ছিল না, হঠাৎ পা ভেঙ্গে শুয়ে পড়ল ; আর তাকেই তোমার সেবা শুশ্রূষা করতে হ'বে—এ কি অত্যাচার ! তুমি ভাবছ কেন সে হাঁসপাতালে গেল না। এই না ?

জাহ্নবী কথা কহিল না।

মাণিকলাল বলিল—কিন্তু তা কেন জাহ্নবী ? আমি বাড়ী এসেছি বলেই যে তোমার সেবা পাওয়ার দাবী করে' বসব—এমন মূঢ় নির্ব্বোধ আমি নই !

মাণিকলাল ম্লানমুখে জাহ্নবীর অসামান্য সুন্দর করুণ চোখের তারার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের করুণ ম্লান একাগ্রতা জাহ্নবী দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সে হঠাৎ সাড়া দিতে পারিল না—ব্যাণ্ডেজটার দিকে চোখ রাখিয়া, নিজের মনটিকে লইয়া কি ভাবিতেছিল কে-জানে !—

মাণিকলাল আবার বলিল—একজন ডাক্তার ঠিক করে দিও যে ড্রেস ক্রেস গুলো করে দিয়ে যাবে, আর তোমরা পাঁচজনে যতটুকু পার—দেখো শুনো ! তাহ'লেই যথেষ্ট হবে।

জাহ্নবী বলিল—ডাক্তার আমি ঠিক করে দেব'খন। কিন্তু...

মাণিকলাল হাসিল, বলিল—আমি জানি। তা পয়সা লাগ্‌বে না, কেমন ?

জাহ্নবী চুপ করিয়া রহিল। মাণিকলাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—কথাটা কেন বল্লুম জান? জান না? বলছি। আমার কেমন ধারণা ছিল যে এতদিন যেখানে ছিলুম সেখানটা হ'ল কেবল খরচেরই জায়গা, আর বাড়ীটা হ'চ্চে জমাবার। বুঝলে?

জাহ্নবী কথা কহিল। একটু কঠিনস্বরে বলিল—যদি জান্তেন,……

মাণিকলাল বলিল—গেছলুম কেন? এই ত! যদিই বা গেছলুম, রইলুম কেন? এ কথাটার উত্তর ঠিক করতে পার নি। তোমাকে ত বের সময়ই দেখেছিলুম—তুমি যে সুন্দরী তা'ও জান্তুম! তোমার তুলনায় সে যে জোনাকী তা'ও কি আমি জান্তুম না—জান্তুম! তোমার চোখ—না, না তুমি রাগ কর না। এতে রাগের কথা আসতেই পারে না। ও কথা থাক্‌বে—তা থাক্। তবে এটা ঠিক সুন্দরী চাইলে তোমার কাছ ছাড়া হ'বার আমার যো ছিল না,—এখানেই পড়ে থাকতে হ'ত।

জাহ্নবীর সমস্ত মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সে সংযত হইয়া বলিল—ও কথা থাক্।

একটা মাতালের মুখে রূপবর্ণনা তোমার সুবিধে ঠেক্‌ছে না—না! তা কি ঠেকে? কিন্তু আমি ত রূপবর্ণনা করছি নে—আর করবই বা কোত্থেকে! আমি যা বলতে যাচ্ছিলুম—সে না হয় থাক্—আর একদিন বলব। আজ তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে।

জাহ্নবী কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইবার সময় এটুকু সে বুঝিতে পারিল, লোকটা মাতালই হোক, আর যাহাই হউক, ভিতরটায় তাহার কোন গোল নাই এবং তাহার মনের গ্লানিও অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'মাণিক প্রসঙ্গ।'

যে জিনিষটা কখনও ভাবা হয় নাই, ভাবিতেও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত, মানবজীবনে এমন এক একটা সময় সত্যই আসিয়া পড়ে যে সেই সঙ্কোচ দ্বিধার কারণটিকে লইয়াই নাড়া চাড়া করিতে হয়। আবার স্বভাবের এমনি নিয়ম যে সুরবাঁধা বীণাটির মত সুমিষ্ট সুর-লহরী সে স্পর্শে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। ঠিক এই কথাটাই দ্বারের দিকে মাণিকলালের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জাহ্নবী ভাবিতেছিল।

কক্ষের দেওয়ালে একটি মৃদু আলোক নিশান্তের মত ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল; একটা বাজা ঘড়ি এই মাত্র অরুণোদয়ের সম্ভাবনা জানাইয়া দিয়াছে—জাহ্নবী 'উঠি উঠি' করিয়াও উঠিতে পারিতেছিল না।

প্রথম রাত্রে সে অন্যঘরেই শুইয়াছিল—মধ্যরাত্রে মাণিকলালের যন্ত্রনা-কাতর-ধ্বনি শুনিয়া সে অনিচ্ছাসত্বেও এখানে আসিয়া বসিয়াছিল। বিদ্রোহী হাত দু'খানিকে শাসন করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল—আর সেই অবস্থাতেই যে ছয় ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে তাহাও সে ঐ ঘড়িটা বাজিবার আগে জানিতে পারে নাই।

বাড়ীর সকলে উঠিয়া গৃহকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে—ধোয়া মোছার শব্দ শুনিয়া জাহ্নবী তাহা বুঝিতে পারিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া আলোটি নিবাইয়া দিল।

মাণিকলাল জাগিয়াই ছিল, বলিল—একটু শোবে কি ?

জাহ্নবী তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া পায়ে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মাণিকলাল বলিল—একটু শোবে না ? সমস্ত রাত্র ত বসে আছ।

জাহ্নবী বলিল—রোদ উঠে গেছে।

বল কি !—বলিয়া মাণিকলাল উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। পুনরায় শুইয়া পড়িল, বলিল—এখন আমি ভাল আছি—তুমি যাও।

দু'তিনমিনিট জাহ্নবী উঠিল না, তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শ্বাশুড়ী বলিলেন—মাণিক কি ঘুমুচ্ছে বৌমা ?

না—জেগে আছে—বলিয়া জাহ্নবী রাত্রি জাগরণক্লান্ত বিরস মুখে স্নান-ঘরে চলিয়া গেল।

শ্বাশুড়ী পুত্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে ভাবিলেন—ওকে ঠিক বুঝতে পারলুম না। নাঃ! রাত জেগে বিছানার পাশটিতে বসেও রইল, আবার জিজ্ঞেস করতেই মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করে' চলে গেল!

জাহ্নবীর শ্বাশুড়ী ভাবিতেছিলেন—তবে কি এতকাল পরেও হারাণ রতন পাইয়া সে হেলায় হারাইবে ? মাণিক কি শুধু সেবার আশাতেই গৃহে ফিরিয়াছে ? জাহ্নবীর কাছে চাহিবার পাইবার অনেক জিনিষই তো তাহার আছে। সে যদি তাহা না পায়, শুধু সেবার হস্তে কি তাহার মন উঠিবে! বিরস মুখের অক্লান্ত সেবা যে কোন সময়েই কোন স্বামীর পক্ষেই লোভনীয় নয়—তাহা ত তিনি জানেন! আর জাহ্নবী এত বুদ্ধিমতী হইয়াও কি সে'টা জানে না ? তবে কিসের নারীত্ব! কিসের সেবা।

এই দুর্জ্ঞেয় নারীটি তখন কি করিতেছিল!

সে একটা প্রকাণ্ড টবের সামনে বসিয়া তর্জ্জনী সঞ্চালনে জল নাড়িতে-ছিল, আর ভাবিতেছিল—কনককে খবর দিবার কি হয়! সে কি চিঠি লিখিয়া জানাইবে? কি লিখিবে? মাণিকলাল পীড়িত না স্বামী পীড়িত? স্বামী! কনক হাসিবে না? স্বামী! বিবাহের ছয় বৎসর পরে যাহার সঙ্গে কালই প্রথম সাক্ষাৎ! এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

ভাবিতেছিল তাহাই লিখিতে হইবে। কিন্তু সেই পত্র ত উমাসুন্দরীর হাতেও পড়িতে পারে! তিনি যে শক্তি বলে তাহার গোপন কথাটি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কি বলিবেন! এত সহস্র সহস্র ডাক্তার থাকিতে কনককেই বা ডাকিবার উদ্দেশ্যটা কি!

ঠিক হইয়াছে! কনকের ডাক্তারখানায় দশটার পর লোক পাঠাইয়া দিলেই হইবে। চিঠিরও দরকার নেই—চাকর শুধু বলিবে—দিদিমণি ডাকিয়াছেন—সেই যথেষ্ট। কনক আসিবে না? নিশ্চয়ই আসিবে।

হঠাৎ জলসিক্ত বিবর্ণ আঙ্গুলটার পানে চাহিয়া রাত্রের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আঙ্গুলটা জল হইতে তুলিয়া সে নিজের মনেই বলিল—কাল রাত্রেও এটা ঠিক এই রকমই পাংশু হ'য়ে গেছল!

রাত্রে তাহার সেবা নিরত হাতখানি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া মাণিকলাল বলিয়াছিল—এই খানটায় হাত বুলিয়ে দাও, জাহ্নবী।

জাহ্নবী হাতটা টানিয়া লইতে পারে নাই, কিন্তু সেটা যে একে-বারেই রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে—এবং রক্তের সঙ্গেই অনুভূতিও চলিয়া গিয়াছে—সে-কারণেই সে'টা টানিয়া লইতে পারে নাই—ইহা সে বুঝিয়াছিল।

স্নান সারিয়া ফেলিয়া আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কেশ সংস্কার করিয়া

লইল। যখন মুকুরে দেখিল যে মুখে বা চোখে অবসাদের চিহ্নও নাই—তখন একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

হিরণ তাহাকে দেখিয়াই বলিল—বৌ, ডাক্তারকে খবর দিয়েছ ?

জাহ্নবীর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, তখনি বলিল—কাকে ?

কনককে-গো, আবার কা'কে ? তা'কেই ত ডাকবে ?

খবর দেব'খন—বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

হিরণ পুনরায় যখন তাহাকে দেখিতে পাইল, বলিল—ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডাক্‌তেও আপত্তি নেই—বুঝলে বৌ !

জাহ্নবী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসিল—তার মানে ?

হিরণ হাসিমুখে বলিল—মানে—তুমিই জান।

সে চলিয়া গেল ! কিন্তু জাহ্নবী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নড়িতে পারিল না। যে জিনিষটা তাহার নিজের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের মতই অস্পষ্ট ঘোলাটে ছিল, তাহাই যে অন্যের কাছে একেবারে সূর্য্যালোকে ঝক্ মক্ করিতেছে—হিরণের কথাটা কি সেই ইঙ্গিতই করিল না !

হিরণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দেখ বৌ, আমি বলি কি, ভিজিট খরচ না বাঁচিয়ে একজন সাহেব ডাক্তারই ডাকা যাক্।

জাহ্নবী অকূলে কূল পাইল; সহজ ভাবেই বলিল—কেবল ড্রেস করবার জন্যে বড় ডাক্তারের দরকার কি !

হিরণ বলিল—আর কনকের উপর বিশ্বাসও আছে। তাই হোক,—কি বল ?

জাহ্নবী উত্তর দিল না, তাহার প্রয়োজনও ছিল না। হিরণ প্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

শাশুড়ী বলিলেন—একটু কিছু মুখে দিয়ে যা বাছা, কাল রাত্রে ত কিছুই খাস্ নি।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসিল—শান্ত কোথা মা?

সকালে একটি মাষ্টার শান্তকে প্রথমভাগ পড়াইত, শাশুড়ী বলিলেন—সে পড়ছে।

জাহ্নবীও তাহা জানিত। অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়াছে, এখন লজ্জানত মুখে বলিয়া উঠিল—চল মা!

জাহ্নবী জলযোগ করিয়া মাণিকলালের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—একটু গরম দুধ খাবে?

গরম দুধ—তা' খেতে হ'বে বৈকি!—বলিয়া সে হাসিল।

জাহ্নবী বাহির হইয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। মাণিকলাল গরম দুধের বাটিটার পানে একবার, নতমুখী জাহ্নবীর পানে একবার চাহিয়া বলিয়া উঠিল—তা বলে অতখানি?

জাহ্নবী বলিল—কতখানি আর! এইটুকু দুধ, এ যে শান্ত এক চুমুকে খায়।

মাণিকলাল হাসিল—এবার আরও উচ্চ হাসি। বলিল—এক চুমুক এক চুমুক করছ—এক চুমুকে একটা ডেনিস্‌মণি বড় বোতল নিঃশেষ করেছি।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিল—মদের গুলিভার কিনা, দুধ খেতে ভয় হয়।—আবার সেই হাসি।

জাহ্নবী রাগিল না, বুঝি রাগিবার একটু ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু এই লোকটির সরল উচ্চহাস্য কল্পনা করিয়া রাগিতে পারিল না, বলিল—তার আবার গুমোর কি!

ঠিক! ঠিক! ভারী ঠিক্। মাতাল মদ খেয়েছে—তা'র আবার গুমোর কি!

জাহ্নবী বোধ করি একটু লজ্জা পাইয়াছিল, জোর করিয়া নত চোখ দু'টা তুলিয়া বলিল—খেয়ে ফেলুন।

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল—একবার খাবে বলে ফেলেছ কিন্তু। ঘরে ঢুকেই।

জাহ্নবী বলিতে গেল—সে ত বেশ করিয়াছি—পারিল না! বাটিটা নামাইয়া বলিল— চামচে দেব?

না, অমনিই খাচ্ছি—বলিয়া সে হাঁ করিল।

জাহ্নবী বাটিটা তুলিয়া ধরিল। শেষে আঁচলখানিতে মুখটি মুছাইয়া দিল।

জাহ্নবী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—কি করিবে, থাকিবে না চলিয়া যাইবে।—

মাণিকলাল বলিয়া উঠিল—বস না। সেই গল্পটা বলি।

জাহ্নবী বসিল। কিন্তু গল্প শুনিবার আগ্রহ দেখা গেল না, মাণিকলাল তাহা বুঝিয়া বলিল—শুন্‌বে?

বল।

মাণিকলাল বলিতে লাগিল—বল্‌ছি। আচ্ছা এটার কি নাম দেওয়া যায়! মাতালের জীবনস্মৃতি বলা চলে? কি বল, তুমি ত অনেক লেখা-পড়া শিখেছ? চলে? ঘাড় নীচু করছ—তাহ'লে চলে না। তবেই ত, নাম নিয়েই হ'চ্ছে ফ্যাসাদ। আজ কাল নাম রাখা—তা বইয়েরই বল, আর ছেলে মেয়েরই বল—সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বাপে বল্লে—নাম রাখ

গোবৰ্দ্ধন ; মা বল্লে—বালাই, প্রফুল্লজ্যোৎস্না। বাপ বল্লে—তার মানে? মা বল্লে—আমার মাথা! ছেলের বাপ ত্রস্তে বলে উঠল—ছিঃ ছিঃ ও কথা কি বল্‌তে আছে! এই বলিয়া মাণিকলাল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একমিনিট পরে বলিল—থাক্‌গে নাম। ছাপাতে ত আর যাচ্ছি নে-যে নাম না থাক্‌লে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। তবে দেখ'—তুমি যেন এ'টা শুনে নিয়ে 'অমুক প্রসঙ্গ' বলে কাগজে ছাপিয়ে দিও না—বুঝ্‌লে?

জাহ্নবী হাসিয়া ফেলিল।

মাণিকলাল বলিল—হ্যাঁগা, আজকাল এই রকম না-কি হ'য়েছে?

জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—আপনার গল্পটা বলুন।

এই যে বল্‌ছি—আচ্ছা, আগে কোন্‌টা বলব—পা ভাঙাটাই বলি। বেশ বীররসাত্মক নাটকের মত লাগবে।

"একদিন রাত্রে আড্ডায় বসে গান বাজনা হ'চ্ছে, রামচারণা এসে বল্লে—ক'টা কাবলি এসেছে, তারা রামলালকে চায়। রামলাল ছিল যেমনি ভীতু, তেমনি থল। সে বল্লে—দূর করে দে, দূর করে দে। কিন্তু তখনি ছ'টো কাবলী একেবারে ছ'হাত করে লম্বা—মাথা নীচু করে,—পাছে চৌকাঠে লাগে—ঘরে ঢুকেই রামলালের পাশে এসে দাঁড়াল। আমার তখন অবস্থাটা কি রকম জান? সবই দেখ্‌ছি, অথচ বুঝতে পাচ্ছিনে, বুঝতে পাল্লেও যেন পাচ্ছিনে এই রকম ভাবটা! রামলালের সঙ্গে তর্ক করতে করতে এক বেটা কাবুলি ফস্‌ করে একখানা ছুরী বের করে তার বুকে—ওকি! তুমি ভয় পেলে? থাক্‌ আর—

না—বল। বলিয়া জাহ্নবী সোজা হইয়া বসিল।

"একেবারে ঠিক এইখানটায় বসায় আরকি! আমি—ঠিক বলতে পারিনে

রামলালের কান্নায় অথবা ঝক্‌মকে ছুরিটার ধার দেখে—চমকে উঠ্‌লুম। উঠে কি করলুম জান! একেবারে ছু'বেটাকে বগলে চেপে হড় হড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে রাস্তায় এনে ছু'টোর ছুগালে চার চড়—ছ'হাত লম্বা কাবুলীওয়ালা সেই ছু'টি চড়েই পপাত ধরণীতলে! লোকে হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এই শরীরটা ত দেখ্‌ছ—কি-রকম মনে হয়?—বলিয়া মাণিকলাল জাহ্নবীর মুখের দিকে চাহিয়া গাত্রবস্ত্র খুলিয়া দিল।

জাহ্নবী বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। মুখে উত্তর না দিলেও এ গর্ব্ব করিবার যে তাহার অধিকার আছে বিনাদ্বিধায় জাহ্নবী তাহা স্বীকার করিল।

মাণিকলাল তাহা বুঝিল, বলিল—থাক্‌ পড়ে—বলে উপরে এলুম। রামলাল তখনও কাঁপছিল, তা'কে বল্লুম, চট্‌ করে' ছ' আউন্সের ছু'টো পেগ ঢেলে ফেলতে। একটা তার, একটা আমার। মুখ থেকেও গেলাসটি নামিয়েছি, পাঁচবেটা একেবারে 'কাঁহা কাঁহা' করতে করতে সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল! রাণী বারান্দা থেকে এসে বল্লে—ছ'টা। আমারও মুখ শুকিয়ে গেল—বুঝ্‌লে-না! শরীরটা যতই হোক, ছ'টা লোকের বিরুদ্ধে যে পারব না তা ত আমি জানি। কিন্তু তখন আর উপায় কি! প্রাণ ত যাবেই, আগে হ'লে একা রামলালেরই যেত, এখন দুজনেরই।

জাহ্নবীর ঠোঁট ছু'খানি কাঁপিতেছিল, সে ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল—তারপর?

"তারপর। সে ভারি মজা। রামলাল করলে কি! আমাকে একেবারে পাঁজাকোলা করে' তুলে ফেললে। আমি বল্লুম, রামলাল, করিস কি রে? সে কথা কইতে পারিছিল না, বড্ড নেশা হ'য়েছিল কি-না—পাঁজা কোলা করে তুলে একেবারে বারান্দা থেকে রাস্তায় ফেলে দিলে।

জাহ্নবী ভয়ার্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ !

হ্যাঁ। অনেকক্ষণ আমি বুঝতে পারি নি—যে কি হ'ল। তারপর, যদিও অসময়ে কারু দেখা না পাওয়াই সম্ভব ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে সবই উল্টো। রাণী পর্য্যন্ত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতালে গেল। তারপর হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখানেই এসে হাজির ! জানই ত !

দশটা বাজিতে দেখিয়াই জাহ্নবী উঠিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া মাণিকলাল বলিল—তুমি বড় বিরক্ত হ'য়েছ না ? এসব গল্প কারু কাছে—বিশেষ করে তোমার কাছে বলাটা ভারি অন্যায় হ'য়েছে।

কিছু অন্যায় হয় নি—বলিয়া জাহ্নবী বাহির হইয়া গেল।

মাণিকলাল পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার।

বেহারী কনকের ডাক্তারখানায় আসিয়া শুনিল, বাবু তখনও আসিয়া পৌছান নাই। জাহ্নবী সত্বর ফিরিতে বলিয়া দিয়াছে এবং সে যে সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াই আছে এ'টা সে কেমন আপনা হইতেই বুঝিয়াছিল।

সে অপেক্ষা করিবে, কি ফিরিয়া যাইবে—কি, কি করিবে—এইরকম ভাবিতেছে এমন সময় কনকের গাড়ী থামিল। বেহারী নমস্কার করিতেই কনক বলিল—কি খবর বেহারী ?

বৌ দিদিমণি ডাকিয়াছেন—এখনি যাইতে বলিয়াছেন—এইটুকু মাত্র বেহারী জানাইতে পারিল। এখানে সে নিজের মাথাই খরচ করিয়াছিল তাহার জন্য বেচারাকে লাঞ্ছিত হইতেও হইয়াছিল।

কনক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বেহারী কোচবক্সে বসিয়া কোচম্যানের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে শুখা টিপিতে লাগিল।

কনক যখন সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, জাহ্নবী উপরের বারান্দায় একখানি তোয়ালে শুকাইতে দিতেছিল। কনক ডাকিল না, উপরের দিকে চাহিয়া রহিল। জাহ্নবী তাহাকে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে উঠিয়া আসিতে বলিল।

জাহ্নবী তাহাকে নিজের কক্ষে লইয়া আসিল। একটি কথাও বলিল না। কনক ঘরে ঢুকিতেই মাণিকলালকে দেখিতে পাইল। চিনিতে বিলম্ব হইল না—একবার মাত্র দর্শনেই চিনিতে পারিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহ্নবীর পানে চাহিতেই তাহার চোখ দুটিতে কি দেখিল বলা যায় না, দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বলিল—কি? কি খবর?

জাহ্নবী বলিল—অসুখ।

কি অসুখ?

মাণিকলাল নিঃশব্দে পা বাহির করিয়া দিল।

কনক সেদিকে না চাহিয়াই—বলিল—কী করব কী!

জাহ্নবী একেবারেই কথা কহিতে পারিল না। পায়ের ব্যাণ্ডেজটা খুলিতে খুলিতে বলিল—এইটে—

কনক বলিল—সে আমি জানি! কিন্তু সে কথা বলে পাঠাও নি কেন? আমি জানব কেমন করে যে তোমার ঘরে রোগী দেখতে ডেকে পাঠিয়েছ! বেহারী ত সে কথা বল্লে না। কোথায় গেল সে ষ্টুপিড্‌টা।

মাণিকলাল এতক্ষণ কথা কহে নাই, কহিতও না, কিন্তু জাহ্নবীর ব্যথা-ক্ষুব্ধ মুখের পানে চাহিয়া বলিল—ডাক্তার মানুষ! এটা ত বুঝতে পারা উচিৎ।

না—উচিৎ নয়—বলিয়া কনক চীৎকার করিয়া উঠিল। জাহ্নবীর দিকে ফিরিয়া বলিল—খবর দিতে পার নি যে জিনিষপত্র সব নিয়ে এস।

জাহ্নবী আস্তে আস্তে বলিল—সে'টা ভুল, কিন্তু—

রেখে দাও তোমার কিন্তু! ডাকগে যাও, ডাক্তার। আমার দ্বারা ও সব হ'বে না।—বলিয়া কনক চৌকিটা টানিয়া বসিয়া পড়িল।

দু'তিন মিনিট পরে জাহ্নবী একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—কা'কে ডাক্‌ব বলে দাও।

বোধ করি নিজের আকস্মিক উষ্ণতায় কনক নিজেই লজ্জানুভব করিতেছিল, নতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল—বেহারীকে।

জাহ্নবী কথাটা বুঝিল না, জিজ্ঞাসিল—কাকে?

বেহারীকে! বেহারীকে! ইউ ষ্টুপিড্—

জাহ্নবী বাধা দিয়া বলিল—আমার ভুল, আমাকেই ধম্‌কালে ত—আবার ওকে কেন?

কনক লজ্জিত হইয়াই বলিল—বেহারী, যা ঐ গাড়ী করেই যা—গিয়ে হরিশ বাবুকে অস্ত্রপাতি, তুলো টুলো নিয়ে ডেকে নিয়ে আয় বেটা—ভূত!—

আবার!

কনক মৃদু হাসিয়া মাণিকলালের পা টানিতে টানিতে বলিল—কি হ'য়েছিল মশাই?

মাণিকলাল বলিল—তাইত! সাতকাণ্ড রামায়ণটা আবার বল্‌তে হ'বে।

শুনছ—তুমিই সে'টা বলে দাও। তোমার কাছে বলেছি বলে' কি সকলের কাছেই আমি বলতে পারি!

জাহ্নবী এক মুহূর্ত্ত বিবর্ণ মুখে কি ভাবিয়া লইল, তারপর অনিমেষ দৃষ্টিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সুপুষ্ট পা'টি দেখিতে দেখিতে বলিল—ভেঙ্গে গেছে। তার বেশী জানার দরকার আছে কি?

কনক তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—না, দরকার নেই।

মাণিকলাল সহাস্যে জিজ্ঞাসিল—আপনি ডাক্তারী করেন?

কনক বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিল—না, উপন্যাস লিখি।

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল—বেশ, বেশ। ত' আমাদের দু' একখানা পড়তে দেবেন। বাঙ্গালা উপন্যাসের আমি একজন অক্লান্ত পাঠক। কি বল?—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

যখন বিবাহ হইয়াছিল, কনক শুনিয়াছিল, মাণিকলাল বি-এ পাশ করিয়া কোন্ একটি পিতৃবন্ধুর সহিত রেলে কন্ট্রাক্টারি করিতেছে। কিন্তু এখন তাহার ব্যবহারটা শিক্ষিতের মত বলিয়া বোধ হইল না। সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতে লাগিল। একবার ভাবিল—চলিয়া যায়—কলকাতায় ঢের ডাক্তার আছে, ডাকগে যাও, আমার দ্বারা ওর চিকিৎসা হবে না। আবার ভাবিল—না, তাহা আরও বেশী অন্যায় হইবে। তাহার শিক্ষিত অন্তঃকরণ এ যুক্তিতে সায় দিল না!

কনক জাহ্নবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—কবে এলেন?

জাহ্নবী সাড়া দিল না, দিল মাণিকলাল। সে হাসিয়া বলিল—কাল, মশায়, কাল। হাঁসপাতাল থেকে একেবারে এখানে! অবশ্য আরও জায়গা ছিল—কিন্তু গার্হ্যস্থ পর্ব্বটা কখনও দেখা হয় নি বলে—

কনক দাঁড়াইয়া উঠিল, কণ্ঠে একটু জোর দিয়াই বলিল—আমি নীচে বসছি—ওরা এলে আসব।—সে নীচে নামিয়া গেল।

জাহ্নবী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে-যেন আর মাণিকলালের দিকে চাহিতে পারিবে না। মাণিকলাল অনেকক্ষণ অবধি নিস্পন্দ জাহ্নবীর পানে চাহিয়া রহিল। জাহ্নবীর মুখের কোন অংশটাই মাণিকের দৃষ্টিগোচর হইল না, সে কেবলমাত্র অবনত-অবগুণ্ঠিত মাথাটাই দেখিতেছিল। তিন মিনিট সময় কাটিয়া গেল, মাণিকলাল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে অম্লান কণ্ঠে বলিল—দুঃখ কি, জাহ্নবী! ওঁর মনের ভাবটাই উনি প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়—ঐটিই হ'ল স্বাভাবিক। আমি ত অন্য রকম আশাই করি নি—এই আশা করেছিলুম। তবে তোমার সম্বন্ধে আমি বড়ই নিরাশ হ'য়েছি, জাহ্নবী। অত্যন্ত।

জাহ্নবী মুখ ফিরাইতেই সে বলিল—তোমার সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করেছিলুম, পেলুম ঠিক তার উল্টো। এতকাল পরে এই অপদার্থ রুগ্ন লম্পটের যে তুমি সেবা করতে এগিয়ে আসবে এমন করে'—এ আমি জানতুম না। কিন্তু সকলেই ত আর জাহ্নবী নয়।—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সীতা নাই,—কেহ নাই!

উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া ড্রেস করিয়া কনক জাহ্নবীর সঙ্গে স্নানঘরে গেল। জাহ্নবী সাবানটা তাহার হাতে দিয়া বলিল—দেখ, আজ তোমাকে কষ্ট দিলুম, আর নয়। কাল থেকে আমি অন্য ডাক্তার ডাকব।

কনক হাত ধুইতে লাগিল, কথা কহিল না। জাহ্নবী পুনরায় বলিল—কি লাঞ্ছনাটাই না করলে! ছিঃ ছিঃ।

বস্তুতঃ নীচে নামিয়া পূর্ব্বাপর সকল কথা আলোচনা করিতে সে নিজেই অন্যায় যে কতদূর গড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই প্রতিবাদ করিল না।

জাহ্নবী বলিল—আমি কিন্তু এ-আশা করি নি।

কনক মুখ তুলিতেই জাহ্নবীর বেদনামাখানো চোখ দু'টি দেখিয়া কষ্ট অনুভব করিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমাকে মাপ কর, জাহ্নবী।

জাহ্নবী বলিল—মাপ চাওয়ার দরকার নেই। তবে কাল থেকে আর তোমাকে আস্‌তে হ'বে না।

কনক এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল—তোমার বারণ স্বত্ত্বেও আমি আস্‌তে পারি, তা জান?

জাহ্নবী বলিল—তা পার, কিন্তু এস না। আমি বলে দিচ্ছি।

কনক বলিল—আচ্ছা—সে দেখা যাবে।—সে ভাবিল, অভিমানে মানুষের মুখ হইতে এমন সকল কথা বাহির হইয়া পড়ে—যাহা একেবারেই অভূত-পূর্ব্ব এবং অচিন্তনীয়। সেই অভিমানের খড়ের আগুনই যে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া ক্ষোভের পরও শান্তির অন্তরায় হইয়া থাকে, ইহা কনকের জানা ছিল।

কনককান্তি ভাবিতেছিল—যাক্ মাণিকলালবাবু যে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। তাঁহার এই মতি-গতি বজায় থাকুক, জাহ্নবী তাঁহাকে সুখী করিতে পারিবে। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাহ্নবীকে ত জানি।

আবার ভাবিতেছিল—কিন্তু ওসকল লোকের নিয়মই যে উল্টো। রোগে যখন গলাটি টিপে ধরে তখন একেবারে পায়ের তলায়, ছেড়ে দিলেই আবার সেই বত্রিশ লাফ্। কিন্তু—না, জাহ্নবীর হাতের গুণ আছে। সে কি মাণিকলালকে ফিরাইতে পারিবে না? পারাই ত সম্ভব।

তাহার পরেই নিজের আচরণটা মনে পড়িয়া গেল।

সে ভাবিতে লাগিল—মাণিকলালকে দেখিয়া তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া-ছিল। হওয়াই স্বাভাবিক কি-না! ওঃ—সে-কি কম অত্যাচারটা করিয়াছে। ত্যাগের বড় শান্তি যে নারী-জীবনে আর নাই! সে সেই মহাশান্তিটাই জাহ্নবীকে দিয়া-আসিয়াছে—তাহাকে দেখিয়া রাগ হইবে না ত কি হইবে!

আচ্ছা—তাই বা ইহারা পারে কি করিয়া? এই ত মাত্র কয়দিন সীতা গিয়াছে—কনক ত কেবলই বিদায়কালে সীতার অশ্রুসজল মুখখানিই ভাবিতেছে।

ছাইচাপা আগুনকে একবার খোঁচাইয়া দিলে আগুন যেমন আবার

উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সীতার প্রসঙ্গমাত্রে কনকের হৃদয় সচকিত হইয়া উঠিল।

তাহাদের ত এই একবছর মাত্র বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেই অবস্থাটি কি-রকম দাঁড়াইয়াছে দেখ-দেখি! সে যখন কলেজে পড়িত, উচ্চকণ্ঠে বলিত—কোর্টশিপ নইলে বিবাহ—সে বিবাহই নয়। তারপর—কোথা হইতে এই ষোড়শী আকাশের কোন্ প্রান্ত হইতে একটি ভ্রষ্টতারকার মত আসিয়া উপস্থিত হইল! পৃথিবীতে কত কিশোরী ষোড়শী ত সে দেখিয়াছে—কিন্তু কোন আকাশের কোন সাঁঝে-ভোরেই ইহাকে দেখে নাই, বেশী-কি—ইহাকে কোনদিন সে স্বপ্নেও জানিত না,—সে আসিল। একবৎসর পরে পিতৃগৃহে যাইবার সময় কাঁদিল, যাইতে চাহিল না। এ-সব সম্ভব হয় কেমন করিয়া!

ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল—সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মেয়েটি কখন্ কোন্ সময়ে তাহার জীবনের তারে তারে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে—সে জানিতে পারে নাই। তাহার সেবাটুকু, তাহার মুখের মৃদু হাসিটুকু, কণ্ঠের কোমল-স্বরটুকু—সব একসঙ্গে তাহার কাছে মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল—ইহাও সে খুব বেশী দিন হইতে জানিতে পারে নাই।

খাটিয়া খুটিয়া দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া সেই একটিমাত্র বাহু উপাধানেই মাথা রাখিয়া কত সুখ-বিনিদ্রায় নিশাবসান করিয়া দিয়াছে! আবার কতদিন কত ছোট-ছোট কথায় বড় বড় কলহ করিয়া দু'জনেই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, দু'জনেরই অজ্ঞাতসারে কখন্ দুটি আদরের হাসির ছটায় মন কোথায় বাতাসে ফুরফুরে হইয়া উড়িয়া গিয়াছে—কেহই তাহার কোন ঠিকানাই দিতে পারে না।

গৃহে আসিয়া উমাসুন্দরীর কাছে বসিয়া কনক জানাইল যে মাণিকলাল-বাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহারই চিকিৎসা করিতে জাহ্নবী তাহাকে ডাক দিয়াছিল।

উমাসুন্দরী শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, আবার তখনি বলিলেন—আর কি ডাক্তার ছিল না?

কনক নিরুত্তর। সে, বোধ করি, মাতার প্রশ্নটা সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই।

উমাসুন্দরী বলিলেন—তোকে বুঝি ডাক্তারখানায় খবর পাঠিয়েছিল?

হ্যাঁ।

তা জানি।

কনক সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

উমাসুন্দরী অল্পক্ষণ পরে বলিলেন—কাল আবার ডাকতে এলে, বলে দিস্—অন্য ডাক্তার ডাকুক।

জাহ্নবী এই কথাই বলিয়াছিল, তখন সে তর্ক করে নাই এখন বলিল—সে কি মা! আমাকে যখন তুমি ডাক্তারী পড়িয়েছিলে, তোমার উদ্দেশ্যই ত ছিল, বিনা অর্থে চিকিৎসা করব। এই নয় কি?

এই একটি প্রশ্নে অতীতের অনেক চাপা পড়া কথা উমাসুন্দরীর মনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের, বঙ্গদেশের, স্বদেশবাসীর কল্যাণকামনায় তাঁহার সমস্ত নারীজীবনটাকে তিনি একান্তে পূর্ণপাত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার অর্থানুকূল্যে উচ্চশিক্ষিত হইয়া বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছে; বহু দুঃস্থ সাহিত্যিককে তিনি অনেক দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন—এ সব

কনকের ত অবিদিত ছিল না। মাতৃগর্ব্বে যে তাহার বক্ষটি ভরিয়া আছে।

একমাত্র পুত্র যখন ডাক্তারি পড়িতে গেল, স্বামীর ইচ্ছা ছিল সে বিলাত যায়, কিন্তু তিনি তাঁহাতে সম্মত হ'ন নাই। পাছে পুত্র বিলাত প্রত্যাগত হইয়া চাল বাড়াইয়া ফেলে এবং তাঁহার জীবনের সাধ অপূর্ণ করিয়া দেয়—এই আশঙ্কায় একদিন সত্য সত্যই তিনি মলিন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কনক সে কথা জানিত—মাতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবে না বলিয়াই সে বিলাতের প্রলোভনটা হাসিমুখে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল।

মাণিকলাল একে একে সবই শুনাইয়া দিয়াছে এবং কোন গোপনতাই আর জীবনে রাখে নাই, এই সংবাদটি জাহ্নবী কেবল তাহার প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার কুণো মন ক্রমাগত কোণ খুঁজিয়া মরিলেও ভিতর-বাহির খোলা এই লোকটার কাছে, তাহার প্রকাশের আলোর তলে জাহ্নবীর কুণো মনও কোণ ছাড়িয়া আসিল। জাহ্নবী বুঝিতে পারিয়াছে যে এই পা-ভাঙ্গা লম্বাচৌড়া লোকটার ভিতরে এমন কোন্ একটা গুণ আছে যাহার বলেই সে জাহ্নবীর বিমুখ চিত্তেরও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছে! নিজের জীবনই সে কোন-দিন নিজের কাছেই প্রকাশ হইতে দেয় নাই, চিরদিনই অপ্রকাশের মধ্য দিয়া জীর্ণ তরীখানি বনান্তরাল দিয়া বাহিয়া আনিয়াছে আজ মাতালের মুখে রাজগর্ব্বের মত প্রকাশ্য-কঠিন ,কোমল পাপপুণ্যের ইতিহাস নির্ব্বিকার চিত্তে শুনিয়া গেল, তখন আর আগুণ রহিল না, বরং আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, এমনি করিয়া তন্ময় হইয়া সে তাহার সব ক্লান্তি-অবসাদ-গ্লানি ফেলিয়া দিতে পারিলে—হয়ত তাহার হৃদয়ও মাণিকলালের মতই সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিত।

আজ মায়ের মুখে অন্যরূপ আদেশ শুনিয়া বিস্ময়াতিশয্যে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আর উমাসুন্দরীর ক্ষোভ রাখিবার স্থান ছিল না। কনক দু'তিন মিনিট উত্তরের অপেক্ষা করিয়া বলিল—কি বলছ-মা ?

উমাসুন্দরী উত্তর দিতে পারিলেন না।

বিস্ময়বেগ কমিলে কনক বলিল—তুমি বল্‌ছ মা যে আপনার লোকের চিকিৎসা-টা নিজের দিয়ে ভাল হ'য়ে ওঠে না—সে ঠিক। কিন্তু মাণিক-লালের অসুখ ত তেমন কিছু নয়—শুধু পায়ের একটা ঘা—সেইটেই ধুয়ে মুছে ড্রেস করে দিতে হয়। এ-ও যদি আপনার লোক হয়ে না করব !

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, থামিয়া গেল। একটু পরে আবার বলিল—আজ ভারি চটে গেছলুম্ মা—সেখানে। যা-তা কতকগুলো বকেও ফেল্‌ছিলুম তা'কে ! তারপর, আমার ভারি লজ্জা হ'য়েছিল, তাই সে আমাকে আর যেতে বারণ করে দিয়েছে।

উমাসুন্দরী চুপ করিয়া রহিলেন। এই 'সে' যে-কে বুঝিলেও কেন-যে বা কেমন করিয়া সে নিষেধ করিতে পারিয়াছে—উমাসুন্দরীর কবিচিত্ত হইতে এই সব প্রশ্নের কোন জবাবই আসিল না।

কনক বলিল—আমারই অন্যায় হ'য়ে গেছল মা। রাগ আমি সামলাতে পারি নি।

পুনশ্চ কহিল—কিন্তু তার সেই বারণ শুনেই কিছু আমি চুপ করে থাকতে পারছি নে। যেতে আমাকে হ'বেই। নইলে তা'কে আরও কষ্ট দেওয়া হ'বে।—বলিয়া, সে জামা কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

এই ঘরে ঢুকিয়া সে কয়েকমুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ

সীতা ছিল না—সে আসিয়া জামার বোতাম খুলিয়া জামাটি লইয়া আলনায় টাঙাইল না—আসিল মধু।

যতবড় ক্ষোভই তাঁহার মনের মধ্যে থাকুক না কেন—কনক প্রস্থান করিতেই উমাসুন্দরী মধুকে ডাকিয়া দিলেন, তাহার জুতা জামাগুলি খুলিবার সাহায্য করিতে। এ গুলি যে সীতার নিত্যকর্ম্ম ছিল, তিনি তাহা জানিতেন।

দরকার নাই—বলিয়া কনক তাহাকে বিদায় দিল। নিজের হাতে আস্তে আস্তে একটি করিয়া খুলিতে লাগিল। যে কাজ সীতা করিত, তাহা অন্ত কাহাকেও না দিয়া নিজেই করিতে লাগিল।

একটি একটি করিয়া খুলে, টাঙাইয়া দেয়, আর ভাবে—না গেলেই বা ক্ষতি কি! জাহ্নবী ত স্পষ্টই বারণ করিয়াছে। সে-যদি না যায়, কেহই আর তাহাকে দোষ দিতে পারিবে না। বলিবে না-যে, বিপদের সময় কনক সরিয়া দাঁড়াইল।

হয়ত সেই মঙ্গল! কিন্তু অন্ত পথে অমঙ্গলেরও ত আশঙ্কা নাই। নাই কি? না—যদিও বা আগে একটু ছিল—না, না তর্কের খাতিরে স্বীকার করা হইতেছে—এখন ত সম্পূর্ণ নিরাপদ!

আর জাহ্নবীই নিষেধ করিয়াছে। তাহার শাশুড়ী আছেন, দেবরেরা আছে—তাহারা ত বারণ করেন নাই। বরঞ্চ ঠিক উল্টা—তাহাকে দেখিবামাত্র জাহ্নবীর শাশুড়ী গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে না গেলে তাঁহারা কি মনে করিবেন? হয়ত নানা কথা ভাবিবেন।—না সে যাইবে! আর দ্বিধা নাই।

জাহ্নবী যে সত্য সত্যই তাহাকে বারণ করে নাই—এ কথা ত তাহার

হৃদয় জানে! সে ভাবিতে লাগিল মাণিকলালের সম্মুখে লাঞ্ছনা করিয়া আমিই ত তাহাকে বলিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। সে-ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমাকেই-যে সর্ব্ব প্রথম আহ্বান করিয়াছে—তাহাও ত আমি জানি! দুনিয়ায় ত ডাক্তারের অভাব নাই, অলিতে গলিতে কত শত ডাক্তার—ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স-ফেরৎ কত উপাধিধারী ডাক্তার ত ছিল—কিন্তু জাহ্নবী আমাকেই ডাকিয়াছে! জাহ্নবীর এই সস্নেহ নির্ভরতায় সে প্রকৃত সুখানুভব করিল। এবং সেবানিরত স্ত্রী-জাহ্নবীর মলিন কেশ-বাস, মুখ-চোখের পাংশু-কৃশ শুষ্কতায় কনকের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। জাহ্নবীর উদ্বেগাকুল বিবর্ণ মুখের ম্লান অস্পষ্ট ছায়াটুকু সারারাত তাহার মনে কেমন-একটা সুস্বাদের আবেশ আনিয়া দিতেছিল। কল্পনাকুশল না হইলেও কনক অনেক জিনিষই কল্পনার রঙে রমণীয় উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছে—কিন্তু এই-জিনিষটা কখনই তাহার কল্পনাতেও উদিত হয় নাই বলিয়া অননুভূত সুখ-তৃপ্তির মধ্যেই সে নির্জীব হইয়া পড়িতেছিল। হয়ত এই সত্যটি তাহার কল্পনার চেয়ে শতগুণ প্রোজ্জ্বল, সুরম্য, কনক তাহার ছায়াই স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই সে যতটা সন্তুষ্ট হইয়াছিল—বিস্মিতও বড় অল্প হয় নাই। বুনিতে বুনিতে হঠাৎ জালটা ছিঁড়িয়া গেলে মেয়েটি যেমন সযত্নে অপর গ্রন্থিগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বুনিতে আরম্ভ করে, কনকও খালিঘরটায় একা বসিয়া গ্রন্থি নির্ণয় করিতে লাগিল।

উমাসুন্দরী কোনদিনই ছোট কথা ভাবেন নাই। দেশনীতি, সমাজ-নীতি অর্থনীতিতে তিনি অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উৎসাহ আগ্রহের অভাব ছিল না—আজ যখন মধু কনকের ঘর হইতে আসিয়া

'দরকার নেই' বলিয়া চলিয়া গেল—এই ক্ষুদ্রকথাটা তাঁহার মাথার মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় ফেলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অস্থির চিত্ত।

সে নিজে কনককে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, কনক যে আর আসিবে না, তাহা জাহ্নবী জানিত। অথচ এই জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করিতে সে কি কষ্টই না পাইয়াছে। দারুণ অভিমানের বশে যে কথাটা তাহার একরকম অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পৃথিবীর কোন মানুষ—যার এতটুকুও হৃদয় আছে সে-যে সেই কথাটাকে বড় করিয়া ধরিয়া বসিবে—তাহা ত সে জানিত না। অথচ কনক যে তাহার অন্যথা করিবে না, বাল্যাবধি কনককে জানে বলিয়াই—এটাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

রাত্রে সে মাণিকলালের পার্শ্বে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। কখন্ তন্দ্রাবশে সে একটু শুইয়াছিল, তাহা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ কাহার স্পর্শে সে জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাহাও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে বুঝিতে পারিল না।

মাণিকলাল অচেতনের মত পড়িয়াছিল, তাহাকে ধড়মড় করিয়া

উঠিয়া বসিতে দেখিয়া বলিল—আমিই তোমার ঘুমটি নষ্ট করে দিলুম জাহ্নবী।

জাহ্নবী বুঝিতে পারিল; সে নিদ্রাবশে যে স্পর্শের সঙ্গে একটা শব্দে চমকিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িতেই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।

মাণিকলাল বলিল—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম জান?

জাহ্নবী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—জানি।

একটি শব্দ সে শুনিয়াছিল—রাণী! আর কিছুই তাহার স্মরণ হয় না, কিন্তু এই নামধারিণীর একটা রংকরা রূপ-কল্পনা করিয়াই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

মাণিকলাল বলিল—অনেকদিনের অভ্যাস—একেবারে ভুল্‌তে পারিনি—তা ত জান।

জানে! জানিত বলিয়াই সে নিঃশঙ্কচিত্তে মাণিকলালের সেবা করিতে পারিতেছিল। নহিলে সে ঘরে পা ফেলিতেও পারিত না।

মাণিকলালও আর কিছু বলিল না, সম্ভবতঃ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নিদ্রাবশে অন্যমনে সে যাহার নিদ্রাটি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সে আর কিছুতেই শুইতে পারিল না।

সে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে নিদ্রামগ্ন স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া একান্তমনে ভাবিতেছিল—সে আর আসিবে না!

কত যুক্তি তর্কের দ্বারা আসা ও না আসার সম্ভাবনা সে চিন্তা করিয়াছে—কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—শয্যা হইতে নামিয়া স্নান ঘরে ঢুকিয়া মুখে হাতে পায়ে জল দিয়া আসিয়া পুনরায়

শয্যায় ঢুকিয়া বলিল—আর ভাবব না। ভেবে ভেবে কি পাগল হ'য়ে যাব না-কি ?

কিন্তু যে চিন্তার সূত্রগুলিকে একবার জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সে আর কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। নিশ্চল বায়ুতে মেঘের পর মেঘ জমিয়া যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বিনিদ্র এই নারীচিত্তটি চিন্তাভারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

প্রভাতে যখন হিরণ জিজ্ঞাসা করিতে আসিল যে কনক আসিবে কি না—জাহ্নবী দৃঢ়স্বরেই বলিল—আসিবে।

হিরণ চলিয়া গেলে, সে ভাবিল—কেন সে একথা বলিল ? যদি না আসে, তখন কি হইবে !

দশটা বাজিতেই কনক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সাড়া পাইয়া জাহ্নবী নিজের স্পন্দিত বক্ষ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল—আসিয়াছে ! সমস্ত রজনীর 'না' কাটাইয়া কখন্ যে 'হাঁ'-টা তাহার মনে উদিত হইয়াছিল সে জানে না ; তবে প্রতিবার না'র সঙ্গেই হাঁ উঠিয়া তাহার বিরোধতিক্ত হৃদয়কে মন্থন করিতেছিল, তাহা সে সঙ্গোপনে অনুভব করিতেছিল।

কনক উপরে আসিয়া নিঃশব্দে কাজ করিল। আজ আর হাত ধুইবার সময় জাহ্নবী তাহার সঙ্গে গেল না—বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

কনক ভিতরে ঢুকিয়া ডাকিল—জাহ্নবী !

জাহ্নবীর হৃদয় দুলিয়া উঠিল, সে অতিকষ্টে দেওয়াল ধরিয়া প্রবেশের লোভ ত্যাগ করিল।

কনক পুনরায় ডাকিল—জাহ্নবী !

আর পারিল না। জাহ্নবী ভিতরে ঢুকিয়া কোন মতে একটা 'কি' বলিয়াই মুখখানি নত করিয়া লইল।

কনক তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, বলিল—কাল যে আমাকে বড় বিদায় করে দিয়েছিলে? যদি না আসতুম—

জাহ্নবী কাঁদিয়া ফেলিল। কনকের সম্মুখে কোনদিন সে কাঁদিবে না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ আর নয়নের জল বাধা মানিল না।

কনক অভিভূতের মত বলিয়া উঠিল—কাঁদছ না-কি? আমি ত এসেছি।

জাহ্নবী কথা কহিল না।

কনক দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়াই জাহ্নবীর অনাবৃত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুর চিহ্নও দেখিতে পাইল না। কিন্তু জাহ্নবী যে গলার ভিতরে কান্নার মত কণ্ঠস্বরটাই লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা বুঝিয়া বলিল—এখান থেকে বেরিয়ে ভেবেছিলুম—আর আসব না। কিন্তু পারলুম না। মুখের কথায় মানুষ যা বলে, করে—কাজে কি ঠিক সেই রকমই হয়। ঠাট্টা করে বল্লাম আসব না বলে তাও কি হ'তে পারে?

জাহ্নবী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, তখনি নামাইয়া লইল।

কনক বলিল—আমি ত জানি জাহ্নবী যে তুমি—

সম্মুখে ব্যাধের ফাঁদ দেখিলে হরিণী যেমন একবার ইতস্ততঃ করিয়া ফাঁদেই ঝাঁপাইয়া পড়ে জাহ্নবী কনকের মুখের পানে চাহিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া কনকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এক মুহূর্ত্ত! তার পরেই সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল।

একটু দূরেই হিরণ দাঁড়াইয়াছিল। জাহ্নবী আর কোনদিকে চাহিতে

পারিল না—দ্রুত পদে কয়েকটি ঘর অতিক্রম করিয়া একটি ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কনক বাহিরে আসিতেই হিরণ সহাস্যে জিজ্ঞাসিল—ঘা-টা কিরকম দেখলেন কনকবাবু?

কোথায় ঘা? সেরে গেছে—বলিয়া কনক দ্রুতপদে নামিয়া গেল। হিরণ নমস্কার করিয়া বলিল—কাল আসছেন ত!

সে-ও যেন মহাপরাধ করিয়া ফিরিয়াছে, স্পষ্ট কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না, কোনমতে জড়িতস্বরে একটা 'দেখি'—বলিয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। অন্যদিন এ-সব উত্তেজনা অবসাদ সীতার সস্নেহ বাহুপাশে আসিতেই সে ভুলিয়া যাইত—আজ তাহার শূন্য ঘরখানা কাহারো সুমধুর রূপের উজ্জ্বল বিভায় বিমণ্ডিত হইয়া নাই—কনকের মনে হইতেছিল—বহুদিন হইতেই এই অন্ধকার তাহাকেই ঘিরিয়া আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

মাণিকের রাগ।

কয়দিন কাটিয়া গিয়াছে, কনক রোজই গিয়াছে—কিন্তু জাহ্নবীকে দেখিতে পায় নাই। রোজই ভাবিয়াছে—না দেখিয়াছে, ভালই হইয়াছে।

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া সে বুঝিয়াছে—এই যে কাণ্ডটি ঘটিয়াছে—উভয়ের নিকট অব্যক্ত থাকিলেও, তাহা একেবারেই নূতন নয়। বিবাহের

পূর্ব্বে কবে কোন্ কথাটায় ভালোবাসা প্রচ্ছন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাও তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বিবাহের পরেও পাঁচ ছয় বৎসর তাহাদের দেখাশুনা ছিল না, কিন্তু অন্তর যে সেই মেয়েটির চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই—আজ সে কথাও মনে হইতে লাগিল।

কবে কোন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে বহিখানি খুলিয়া টেবিলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—কিশোরীটি কাছে বসিয়া সযত্নে ব্যজন করিয়াছে, নিদ্রাভঙ্গে তাহার দ্রুত পদশব্দ শুনিয়াই সে বুঝিয়াছে এবং মুগ্ধ হইয়াছে।

এই সকল ছোট বড় স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির কথা ভাবিতে ভাবিতে সে বুঝিতে পারিল—এমন একটা স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—যেখানে আসা তাহার কোন মতেই উচিৎ ছিল না অথচ এইখানে আসিয়া যে খুব বেশী অন্যায় করিয়াছে এমন গ্লানিও তাহার মনে দেখা দিতে পারিল না।

আজ মাণিকলালের ঘরে ঢুকিয়া সে আর বাহির হইল না। দশটার সময় আসিয়াছিল, বারোটা বাজে তখনও বসিয়া আছে। মাণিকলাল অনর্গল বকিয়া যাইতেছে। কবে সে মদ খাইয়া অত্যন্ত মাতাল হইয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল—নিশি অবসানে রাণী থানায় জরিমানার টাকা জমা দিয়া গাড়ী করিয়া আস্তানায় লইয়া আসে; কবে রাণী ইয়ুরোপ ভ্রমণেচ্ছা জানাইয়া তাহার সম্মতি লাভ করিয়াছিল, পা'টা না ভাঙিলে এতদিন হয়ত রওনা হইতে পারিত এই সকল কথা হইতেছে, জাহ্নবী নত মুখে ঢুকিয়া মাণিকলালকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল— গল্প পেলে আর কিছু মনে থাকে না। যে শুনছে তা'র না-হয় পেট-ভরা আছে, কিন্তু……

মাণিকলাল বলিল—কি করে জান্‌লে যে ভরা আছে? একবার খবরও ত নাও নি তার।

জাহ্নবী সে কথার উত্তর দিল না, সে কনকের দিকে আড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটু সরিয়া আসিল, মাণিকলালের পানে চাহিয়াই বলিল—খবর নেবার আরও লোক আছে ত!

এই সময়ে কনক উঠিয়া দাঁড়াইল। মাণিকলাল বলিল—দেখলে, অন্য লোকের খবর নেবার সম্ভাবনা দেখেই উনি উঠে পড়লেন!

কনক জাহ্নবীর আরক্তমুখের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ মিলাইয়া গেলেও সে কথা কহিতে পারিল না। মাণিকলালও অল্পক্ষণ নীরবে রহিয়া, তারপর বলিল—ভাত আনতে বলে দাও।

জাহ্নবী বাহির হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট পরেই পাচক থালায় অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া আসিল। অন্য দিনের মত জাহ্নবী সঙ্গে আসিল না। মাণিকলাল মনে মনে হাসিয়া আহার করিতে বসিয়া গেল।

প্রায় শেষ হইয়াছে—একখানি পাথরের উপর ধূমায়মান দুধের বাটি বসাইয়া জাহ্নবী নতমুখে প্রবেশ করিতেই মাণিকলাল বলিয়া উঠিল—উঃ এখনও ধোঁয়া উঠ্‌ছে যে।

জাহ্নবী ধীরে ধীরে বাটি-শুদ্ধ পাথরটা মেঝেতে নামাইয়া বলিল—কোন্ সকালেই জাল দেওয়া হ'য়েছিল, এখন নতুন করে গরম করলুম।

মাণিকলাল মুখ না তুলিয়াই বলিল—এত গরম আস্তে আছে? ঐ আর্শিটায় দেখ ত—মুখখানা কি রকম লাল হ'য়ে গেছে।

জাহ্নবী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উনানের ধারে বসিয়া দুধটি গরম করিতে করিতে সে-যে নিজের মনের দ্বন্দ্বে গরম হইয়া উঠিয়াছিল

এবং দু'এক ফোঁটা চোখের জলও তাহার হাতের সাঁড়াশিটায় পড়িয়াছিল—সে ত আসিবার সময় আঁচলে মুখখানি মুছিয়া আসিতে ভুলে নাই। তবু কি তাহার সমস্ত যত্নই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে!

পাখাটা কৈ?—বলিয়া মাণিকলাল এদিকে-ওদিকে চাহিতে লাগিল।

অদৃষ্টের কি পরিহাস! পাখাটিও ছিল, বড় আর্শিখানার উপরে একটা পেরেকে আটকানো। নামাইতে গিয়া আর্শিতে নিজের মুখখানা দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল।

মাণিকলাল বলিয়া উঠিল—দেখলে?

জাহ্নবী তখনও পাখাখানা পাড়িতে পারে নাই, একবার তীব্র দৃষ্টিপাতে মাণিকলালের চোখের পানে চাহিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গিয়া ডাকিল—বেহারী!

বেহারী তোয়ালে ও জল লইয়া সেদিকেই আসিতেছিল, জাহ্নবী রক্তচক্ষে বলিয়া উঠিল—ঘর ঝেড়েছিস্—তা পাখাখানা তুলেছিস্ কোথায় বল্ ত!

ঘটি ও তোয়ালে রাখিয়া বেহারী ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঐ খানেই ত ওটা থাকে বৌ দিদিমণি!

ওখানেই থাকে! তোর সব কথাতেই তর্ক।

মাণিকলাল বলিল—থাকেই ত, আমিত দেখেছি!

জাহ্নবী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সাক্ষীও জুটে গেছে!......মাণিকলাল হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সে তীব্রতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাণিকলালকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছিল।

বেহারী পাখাখানি পাড়িয়া তাহার হাতে দিতেই জাহ্নবী মাণিকলালের সম্মুখে আসিয়া দেখিল—অত্যুষ্ণ দুধের বাটিটায় সে চুমুক দিতেছে।

জাহ্নবী বলিল—বাতাস করি—

থাক্—বলিয়া মাণিকলাল বিকৃতমুখে দুধটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

হাতের পাখাখানা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া জাহ্নবী ধীর পদে বাহির হইয়া গেল।

লোকে যেটাকে জাহ্নবীর একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিতেছিল এবং যাহা নিঃসঙ্কোচে সম্পন্ন হইতে দেখিয়া সহজ নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাই সম্পাদন করিতে যে কতখানি ব্যথা ও দুঃখভোগ তাহাকে করিতে হইতেছিল, অন্যের কথা দূরে থাক,—আজ আহারে বসিবার পূর্ব্বে সে নিজেই ভালরূপে জানিত না। মাণিকলালের রোগশয্যাপার্শ্বে হাসি মুখে বসিতে তাহাকে কতটা ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল—সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারে নাই। যে বিরুদ্ধ চিত্তটিকে সে এত কষ্টে নত করিতে পারিয়াছিল, আজ আবার সে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। আজ প্রত্যেক গ্রাস অন্ন গলাধঃকরণ করিতে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগিতেছিল; এই অনিচ্ছাকৃত আহারটা যে তাহার সহজভাবে হজম হইবে না, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু শ্বশ্রূর সস্নেহ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে কোনমতেই সে ভাতের থালটা ফেলিয়া উঠিতে পারিল না।

শাশুড়ী বলিলেন - তুমি ত ও-ঘরেই আছ বৌমা……

জাহ্নবী অস্ফুটস্বরে বলিল—হ্যাঁ।

সে মাণিকলালের ঘরে ঢুকিল, এখন আর মাণিকলাল কথাও কহিল না। ডাক্তার তাহাকে দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়াছিল বহুদিনের অভ্যাস

বলিয়া সে ত্যাগ করিতে পারে নাই—এজন্য জাহ্নবী কয়েকদিন অনুযোগও করিয়াছিল—আজ মাণিকলালকে নিদ্রিতজ্ঞানে সে সুস্থতালাভ করিল।

হিরণের এক জোড়া মোজা অনেকদিন হইতে অর্দ্ধসমাপ্ত পড়িয়াছিল, আজ সে সে'টাকে লইয়া নবীন উৎসাহে বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের হেতু।

মাণিকলাল সুস্থ হইয়াছে—এখন সে নিজেই হাঁটিয়া বেড়ায়। বাহিরের বৈঠকখানাতেই সে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম যে-রাত্রে আহারাদির পর সে বৈঠকখানায় শয়ন করিতে গেল,—মাণিকলালের জননী জাহ্নবীকে নিকটে ডাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ বৌমা, মাণিক কি বাইরে শোবে?

তা ত জানি নে মা,—বলিয়া জাহ্নবী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মনের মধ্যে একটু আরাম অনুভব করিল।

শাশুড়ী বলিলেন—সে-কি বৌ-মা! তুমি তা'কে অযত্ন করছ?

জাহ্নবী একটু চড়াগলায় বলিল—আমি অযত্ন করছি!!

শাশুড়ী একটু মৃদুস্বরে বলিলেন—তাইত আশ্চর্য্য হ'চ্ছি বৌ-মা। অসুখের সময় এতটা যত্ন তুমি করলে, আর এখন সে ভালো হ'য়েছে—এখন কি তুমি অযত্ন করতে পার?

জাহ্নবী কথা কহিল না।

শাশুড়ী বলিলেন—বেহারী সদর দরজাটা বন্ধ করে দিক্, তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এস।

জাহ্নবী দু'তিন মিনিট কথা কহিল না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল—বলে ডাকাডাকি করে দরকার কি?—তাহাতে শ্বশ্রূ বিস্মিত বিরক্ত হইতে পারেন। আবার ভাবিল—তাঁহাকেই ডাকিতে বলে, কিন্তু সে সাহসও হইল না। না-জানি সে উপরে না আসার কি একটা কারণ বলিয়া বসিবে!

শাশুড়ী ভাবিলেন—জাহ্নবীর নীরবতা সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে—তিনি বেহারীকে ডাকিয়া দ্বার বন্ধ করিতে বলিয়া দিলেন।

জাহ্নবী এক-রকম বেহারীর পিছন পিছনই নামিয়া গেল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।

মাণিকলাল গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিল, বামহাতে নলটি ধরিয়া বলিল—বেহারীকে দিয়ে একটা গায়ের কাপড় পাঠিয়ে দিও ত!

জাহ্নবী বলিল—কি-হবে গায়ের কাপড়, উপরে চল।

মাণিকলাল বলিতেছিল—আমার শরীরটা ভাল—

জাহ্নবী বলিয়া উঠিল—ভাল নেই তা জানি আমি। সেইজন্যেই এঘরে ঠাণ্ডায় শোয়া হ'বে না—চল।

মাণিকলাল আর একটা কি বলিতে যাইতেছিল, জাহ্নবী সে অবসর না দিয়াই বলিল—বেহারী, বাবুর গড়গড়াটা উপরে দিয়ে আয় ত! ফিরিয়া বলিল—এস।

বেহারীকে দেখা যাইতেছিল, মাণিকলাল বলিল—চল—তবে।

জাহ্নবী নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া আসিল। পাশের একটা ঘর হইতে শ্বশ্রূ যে ব্যাকুলনেত্রে পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সে তাহা বুঝিল। এ ঘটনাটি অতি তুচ্ছ ও স্বাভাবিক হইলেও—ত্রয়োদশী নববধূর প্রথম গৃহ-প্রবেশের মতই আজ সে লজ্জারুণ হইয়া উঠিল।

মাণিকলাল শয্যাপ্রবেশ করিয়া দেখিল, জাহ্নবী কি একটা বুনিতেছে, বলিল—শোবে না?

জাহ্নবী নতমুখে জবাব দিল—দেরী আছে। ঠাকুরপো এটার জন্য রোজ তাগাদা করে।

মাণিকলাল বলিল—কে?

জাহ্নবী মুখ তুলিয়া বলিল—ছোট ঠাকুরপো।

মাণিকলাল আর কিছু বলিল না, পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল, নীচে মেঝেতে একটি মাদুর বিছাইয়া জাহ্নবী শুইয়া পড়িয়াছে। গায়ে কিছু ছিল না বলিয়াই বোধ করি সে শৈত্যং অনুভব করিতেছিল,—পা দু'টি হাত দু'টি জড় করিয়া শুইয়া আছে—আলোক উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। মাণিকলাল দু'তিন-মিনিট জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িল। আবার কি ভাবিল, এক-মুহূর্ত্ত পরে আলনা হইতে একখানি সবুজ রঙের শাল লইয়া জাহ্নবীর গায়ে ঢাকা দিয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শুইয়া পড়িল।

দু'তিনদিন পরে মাণিকলাল বৈকালে চা-খাইয়া বাটিটা নামাইতে নামাইতে বলিল—একটু বেরুই, কি বল?

জাহ্নবী বলিল—তা যাও—না।

মাণিকলাল শাল ও ছড়িটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাত্রি ৭টা

৮টা ৯টা বাজিয়া গেল—ফিরিল না। পরদিন বেলা আট্-টার সময় আসিয়া বলিল—কাল আর ছাড়লে না।

জাহ্নবীর মুখ মসীলিপ্ত হইয়া উঠিল, সে কথা কহিল না।

মাণিকলাল বলিল—তোমরা বোধ করি খুব ভাবছিলে?

জাহ্নবী দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—প্রথমটা। তারপর বুঝতে পেরেছিলুম।

বটে?

জাহ্নবী উত্তর দিল না।

মাণিকলাল বলিল—তুমি তাহ'লে আমাকে ঠিক বুঝে নিয়েছ—কি বল?

জাহ্নবী অন্যদিকে মুখ করিয়া বলিল—আমার কথা নাই ধরলে, মা'র দিক্‌টা ভেবে দেখ্‌লে—

মাণিকলাল হাসিয়া উঠিল, ব্যঙ্গস্বরে বলিল—ছ'বছর যে ভাব ছিল, তার চেয়ে নতুন ত নয়।—বলিয়া সে জামা কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

জাহ্নবী দু'তিন মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

নিজের কোন অপরাধ নাই—জানিয়াও সে নীচে নামিয়া শ্বশ্রূর মুখের পানে চাহিতেই পারিল না। তিনিও কোন কথা বলিলেন না। জাহ্নবী নিত্য কর্ম্মগুলি সারিতে, অন্যমনস্ক হইয়া, অথবা ইচ্ছা করিয়াই নিত্য কর্ম্মের মধ্যে দু'একটা ভুল ত্রুটি সে করিয়া ফেলিল, কিন্তু শ্বশ্রূ কোন অনুযোগ করিলেন না, নিজে সেগুলি সারিয়া লইলেন।

বঙ্গ সংসারে এ-রকম ঘটনা বোধ হয় বিরল নহে, কিন্তু জাহ্নবীর কাছে ইহা একেবারেই অপরিচিত। সংসারের সহিত যেদিক্‌টায় সে সুপরিচিত—এ-রকম কখনই ঘটে নাই—বলিয়াই এই নূতনত্ব তাহাকে অত্যন্ত আঘাত

করিতে লাগিল। নীরবতার ভার যখন অবহ হইয়া উঠিলে সে শ্বশ্রুর সম্মুখীন হইয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ-মা, আমি কি অপরাধ করেছি ?

সেকালের গৃহিণীরা বাঁকা কথা কহিতে দ্বিধা করিতেন না—এখন তাহা অনেক স্থানেই দেখা যায় না—জাহ্নবীর শ্বশ্রূও চিরদিন সোজা কথাই কহিতেন, আজ ইচ্ছা করিয়াই পূর্ব্ব প্রথা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—অপরাধ আর কি বাছা! অপরাধ কা'রো নয়—সব আমার অদৃষ্টের!

জাহ্নবী স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহাও তাহার কাছে অপূর্ব্ব!

আজ সে গভীর ভাবেই সীতার দুঃখ অনুভব করিল। উমাসুন্দরী বাঁকা কথা কহিতেন—সীতার বিমুখ চিত্ত অধিকতর বিদ্রোহ করিয়া উঠিত। সে-ই ত তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছে—কিন্তু আজ বুঝিল, সান্ত্বনায় সে ব্যথা দূরীভূত হইবার নহে! ক্ষতে লবণ লেপনের মতই সে অধিক যন্ত্রণা দেয়।

আজ সে বুঝিতে পারিল—সীতার এই দুঃখটা সে কোন দিনই গভীর করিয়া ভাবে নাই। সত্য কথা বলিতে কি—সে কখনও কখনও একটু সুখানুভবও করিত। এবং মনের মধ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য যে আনন্দাতিশয্য গোপন করিতে সে সীতার কাছে কি ভণ্ডামীই না করিয়াছে! কিন্তু সীতাকে যে ভালবাসে, সেখানে যে এতটুকুও ফাঁক ছিল না—তাহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

অনন্ত দুঃখের মধ্যে একটা অসীম পরিতৃপ্তির মতই এই কথাটা তাহার বক্ষে করতালি দিয়া উঠিতে লাগিল—যে কনকের বৌ-কে সে ভালবাসিয়াছে এবং সেই ভালবাসাটুকুর মধ্যে নিজের পীড়িত ব্যথিত হৃদয়টিকে ডুবাইয়া দিয়াছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সেই সুখই দুঃখ আনিল।

বেহারী ও তপসীর মা তত্ত্ব লইয়া আসিতেই সীতা আনীত দ্রব্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বেহারীকে সঙ্গে লইয়া নিজের ঘরটিতে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিল— ভাল আছ সব বেহারী?

বেহারী প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ বৌদিদি, সব ভালই আছে। ও বাড়ীর-ও সব ভাল-ই আছেন।

সীতা জিজ্ঞাসিল—তুমি কেমন করে জান্‌লে বেহারী?

বেহারী বলিল—ডাক্তারবাবু ক'দিন রোজই আস্‌তেন কি-না। কাল আর আসেন নি।

সীতা ভাবিল—রোজই আসিতেন! কেন?—কিন্তু প্রশ্নটা চাকর বেহারীকেও সে করিতে পারিল না।

বেহারী বলিতে লাগিল- সে-ই তাহাকে ডাক্তারখানায় বৌ-দিদিমণির সেলাম দিয়াছিল এবং তুজনেই তখনি আসিয়াছিলেন। তারপর রোজই আসিতেন—এখন ত আর আসিবার দরকার হয় না—জানই ত!

সীতা বলিতে পারিল না যে কিছুই সে জানে না। সে মনের মধ্যে কেবলই কারণ হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল।

বেহারী বলিতে লাগিল—বৌ-দিদিমণি যে বড়-বড় সাহেব ডাক্তার থাক্‌তে আমাদের ডাক্তার বাবুকেই ডাক্‌ল— সে খুব ভালই, না বৌ-দিদি?

বাঙ্গালী বাড়ীতে কাজ করিয়া বেহারী কালো চুল সাদা করিয়া ফেলিয়াছে,—তাহার ধারণা জন্মিয়াছিল—এ কথায় সীতা খুসী হইয়া উঠিবে। কিন্তু বেহারীর সাদা মাথা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে সবের কিছুই সে দেখিতে পাইল না।

সীতা এক মিনিট পরে বলিল—কারু অসুখ ছিল না-কি বেহারী ?

সে কি বৌ-দিদি ! তুমি কি জান না ? আমাদের বড় দাদাবাবু যে ফিরে এসেছেন।

কে ঠাকুর জামাই ?

হ্যাঁ গো। আমি মনে করি তুমি সব জান।

আমি জানিনে বেহারী।

বেহারী বলিল—পা ভেঙ্গে এসেছিলেন কি-না। আমাদের ডাক্তারবাবু এসে রোজ তাই ধুইয়ে দিতেন।

সীতা শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিল—তাঁ'কে কে ডাকৃত ?

বেহারী প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, সীতার মুখের দিকে চাহিতেই সীতা মুখ ফিরাইয়া লইল।

বেহারী বলিল—কি বলছ বৌ-দিদি ?

সীতা বলিল—তাঁকে ডাকৃতে·········

বেহারী তাড়াতাড়ি বলিল—আমিই গেছলুম। বৌ-দিদিমণি পাঠিয়েছিল—ডাক্তারখানায় খবর দিতে।

সীতা এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—আচ্ছা বেহারী·········

কথাটা যেন গলার কাছে আসিয়া থামিয়া গেল। বেহারী হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত্ত পরে বলিল—বেহারী, একদিন রাত্রে ডাক্তারবাবুর নেমন্তন্ন ছিল, তোমাদের ওখানে········

তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বেহারী সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ গো—সেই ত তেনার আসতে দেরী হ'চ্ছিল বলে'—আমিই বৌ-দিদি-মণিকে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে গেলুম। তার দু'তিন দিন পরেই ত আমাদের দাদাবাবু—

সীতা অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল—তিনি গাড়ী থেকে নামেন নি কেন?

কে? বৌদি—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই সীতা বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বেহারী একটু থতমত খাইয়া গেল; আস্তে আস্তে বলিল—কেন নামলেন না, আমি কেমন ক'রে জানব বৌদিদি! তারপরও ত তেনার সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল—জিজ্ঞাসা কর নি কেন?

বেহারী সত্য কথা বলিয়াছে। তাহার উপর মিথ্যা রূঢ় আচরণ করিয়াছে ভাবিয়া সীতা একটু দুঃখ বোধ করিল। সে বেচারার অপরাধ কি?

সীতার মুখের ম্লান ভাবটি অনুমান করিয়া লইয়া বেহারী বলিল—এ ত আর নতুন নয়, বৌ-দিদি। তেনারা হ'ল আপনার লোক—

সীতা অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল—আপনার লোক!

তাই ত মোরা জানি গো।

হ্যাঁ।

কোনদিকে যে-একটা কিছু গোল হইয়াছে, এবং কিরূপ কথা কহিলে আর বাড়িয়া না যায়—সে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বেহারী বলিল—এই সে'দিনও ত—তুমি ত তখন ছিলে

গো—হ্যাঁ ছিলে বৈ কি—একদিন রাত্রে তেনারা গাড়ী করে' এল। আমি বারান্দায় বসাকদের ভজুয়ার সঙ্গে কথা কইছিলুম—তেনারা এল। গাড়ী থেকে নাম্‌ল—দুজনের একখানা শালই—সেই-যে, ডাক্তার বাবুর কাল শালখানা—গায়ে ছিল, নামবার সময় বৌদিদিমণি সেখানা টেনে নিয়ে—আমি দরজা খুলে দিতেই বাড়ী ঢুকে পড়ল।

সমুদ্র-মন্থনের সময় না-কি কোন দেবতা এক নিঃশ্বাসে হলাহল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—কালো-শালটার কথাতে সীতার সমস্ত দেহটা একেবারে কালীবর্ণ হইয়া গেল।

বেহারী এতটা লক্ষ্য করে নাই, অথবা তাহার সাদা মাথা তখন নিজের বক্তৃতাতেই মত্ত ছিল, বলা যায় না—সে সেই শালটি ফেরৎ দিতে গিয়া উমাসুন্দরীর কাছে কি-রকম জেরবার হইয়াছিল—তাহাই বিশদভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল। উমাসুন্দরী তাহাকে যে জেরা করিয়াছিলেন, সেগুলি উত্তরসহ সে সীতার মুখের পানে না চাহিয়াই বলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া সীতা 'তুই নীচে যা, বেহারী'—বলিয়া পাশের দরজা দিয়া অন্য একটা ঘরে চলিয়া গেল।

বেহারী একটুখানি কি ভাবিল, তাহার পরে উঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসিল—তাহ'লে আমরা যাব বৌদিদি ?—সে-যে সীতাকে প্রসন্ন করিতে পারে নাই, তাহা বুঝিয়াছিল। চোখের চাহনিটা না-কি সহজেই বুঝা যায়—বেহারী ইহাও ভাবিয়াছিল—এইমাত্র যে সংবাদটি দিতে বাধ্য হইয়াছে সে'টিতে সীতা প্রীত হয় নাই। বিদায়ের ব্যাপারটা সীতার হাতে নয় জানিলেও সীতার বিরক্তিতে যে তাহার আশু ক্ষতি আছে—তাহা জানিত বলিয়াই সে জিজ্ঞাসিল—আমরা যাব বৌ-দিদি ?

সীতা কি করিতেছিল দেখা গেল না, তাহার স্বর শুনা গেল—না, না—যাবে কি বেহারী ? খেয়ে দেয়ে বিদেয় নিয়ে তবে ত যাবে।

বেহারী একমুখ হাসিয়া বলিল—তোমাদের খাব না ত খাব কার গা ? এই—দেখ' না, তোমার খোকাখুকী হ'লে—কি রকম বিদেয়টা নিই একবার।—একটুখানি অপেক্ষা করিয়া যখন আর কোন সাড়া পাইল না, তখন বাহির হইয়া গেল।

শেষ কথাটার জবাব পাইল না বলিয়া সে দুঃখিত বা নিরাশ হইল না ; একদিন যে সোনার বালা ও নগদ পঞ্চাশটি টাকা সে আদায় করিতে পারিবে—এ ভরসা তাহার ছিল। আজ তাহার মনটি ভাল নাই—তাই আর কিছু বলিল না। আর মন ভাল থাকিবেই বা কি করিয়া ? দেশে থাকিতে ধনিয়ার জরুর সঙ্গে যখন কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল, তখন তাহার স্ত্রী যে বঁটি লইয়া তাহাকে কাটিতে আসিয়াছিল, সে ত তাহার মনে আছে। ইহারা 'ভদ্দরলোক' ও 'বড়লোক' বলিয়া কাটিতেই না-হয় না গেল—কিন্তু মনটি ত খারাপ হইবেই। বৌ-দিদিমণির বাড়াবাড়িটা বেহারীর ভাল লাগে নাই—বলিয়াই সীতার মন খারাপের কারণটি সে বুঝিল। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নীচে নামিবার পথে সিঁড়ির দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবি, ইলেক্ট্রিক আলো ও পাতা গালিচা দেখিয়া ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এই সকলের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে করিতে নামিয়া পড়িল।

তপস্যার মাতা এক-গা গহনা ও লালরঙের ছোপ-কাটা কাপড় পরিয়া বিপুল দেহে কলাপাতায় আহার করিতে বসিয়াছিল, অদূরে আর একখানি পাতা রহিয়াছে—দেখিয়া বেহারী সেইদিকেই যাইতেছিল,—তপস্যার মাতা বলিল—বৈঠো জী !

জী কেতাদস্তুর চাকর, বসিল না। তপস্যার জননীকে গো-গ্রাসে গিলিতে দেখিয়া মনে মনে তাহার মস্তকটি ভক্ষণ করিয়া এবং বাহিরে গিয়া তাহাকে কি-রকম ধম্‌কাইবে ঠিক করিয়া, বেহারী এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

বস বাবা, তুমিও বস।—বেহারী এইটির অপেক্ষাই করিতেছিল, হাসিয়া বসিয়া পড়িল।

যিনি বেহারীকে বসিতে বলিলেন—তিনি যে এই মস্ত সাজানো বাড়ীটার গৃহিণী, বেহারী তাঁহাকে না চিনিলেও—বুঝিল। এবং সে-যে স্বয়ং গৃহিণীর অনুরোধেই আহার করিতে বসিয়াছে—এ কথাটাও একটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তপস্যার মাতাঠাকুরাণীকে জানাইয়া দিল।

কিন্তু সে গর্ব্বের ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, হঠাৎ এমনি এক কাণ্ড হইয়া গেল যে বেহারী, তাহার সঙ্গে স্থূলকায়া তপস্যা-জননীর গরম লুচি ও বেগুণ ভাজা ফেলিয়া পলাইতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইত।

বেহারী যাঁহাকে গৃহিণী অনুমান করিয়াছিল, তিনিই সীতার জননী। ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ সরকার মহাশয়কে কি বলিতেছিলেন, সীতা নামিয়া সেখানেই আসিয়া দাঁড়াইল। দু' একটা কথা কি হইল শুনা গেল না, শেষে সীতার উচ্চ স্বরটি স্পষ্ট হইয়াই শুনিতে পাইল—কাপড় সেমিজ কিন্‌তে হবে না মা। যে গুলো এলো আজ—ঐ গুলোই বিনীতাকে পাঠিয়ে দাও।

সীতার মা বলিলেন—দূর্‌! তোকে দিয়েছে সাধ…,

সীতা বলিল—আমি বল্‌ছি।

সীতার মা বলিলেন—তুই বল্লেই বা! তোর জিনিষ আমি নেব কেন? আমার কিসের অভাব?

সীতা দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—না-নাও থাক্। কিন্তু আমি যে ওর একটা সুতোও ছোঁব না, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি মা।

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন, সীতা কথাটা শেষ করিয়াদিল—যেমন আছে—তেমনি থাকুক। পচুক, কাটুক—আমি ও ছুঁতেও পারব না—বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল।

গৃহিণী বলিতেছিলেন—ওরা রয়েছে, সীতা……

থাকলই বা—বলিয়া সে দুপ্ দুপ্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

যাহাদের ভয়ে গোপনতা, তাহারা প্রত্যেক শব্দটিই শুনিয়াছিল, এবং গলার ভিতর লুচির দলা আড়ষ্ট হইয়া আটকাইয়া গিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বেদনা।

দ্বিতলের একটি কক্ষে একখানি সোফায় সীতা শুইয়াছিল। ঘুমায় নাই—মাঝে মাঝে, অতি ক্ষুদ্র শব্দেও সে চক্ষু চাহিতেছিল—যেন-সে কিসের অপেক্ষা করিতেছে।

এই ঘরটি সীতার বড় প্রিয়—বিবাহের পূর্ব্বে সে এই ঘরটাতেই থাকিত;—ছেলেবেলায় পুতুল খেলিত, বড় হইয়া পড়িত;—বিবাহের পর স্বামীসম্ভাষণটা এই খানেই তাহার প্রথম হইয়াছিল।

আজও সীতার মনে আছে—বিবাহের কিছুদিন পরে কনক আসিয়াছে—এই ঘরটিতে রাত্রে তাহারা শুইয়াছিল। ঘরটি সে চমৎকার করিয়া সাজাইয়াছিল—এ কার্য্যে তাহার প্রধান সহায় ছিল নিশীথ দা'! সেই ত সমস্ত আসবাব কিনিয়া আনিয়া, সেখানে যে'টি মানায় সাজাইয়া দেয়—কনক তাহার সুরুচির প্রশংসা করিয়াছিল।

দেওয়ালে ছবি বেশী নাই—চারিখানি মাত্র। তন্মধ্যে দুইখানি যুগল মূর্ত্তি, একখানি একটি বঙ্গীয় যুবকের প্রতিকৃতি, আর একখানি সীতার নিজের ছবি—এ'খানি নিশীথ আঁকিয়াছিল, বি-এ পরীক্ষার পর ছুটিটাতে বসিয়া বসিয়া সে এই কর্ম্মই করিয়াছিল। মা'র ঘরে সীতার সেই সময়-কারই একখানা আলোক-চিত্র ছিল—লোকে সে'টির সহিত তুলনা করিয়া ইহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিল। নিশীথের চিত্রবিদ্যার পারদর্শীতার সংবাদে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন—সে অন্ততঃ এই বাড়ীটার সকলেরই একখানা করিয়া ছবি আঁকিয়া দিবে, কিন্তু আর সে তুলিকাস্পর্শ করে নাই।

অনেকেই অভিমান করিলেন, কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। মা বলিয়াছিলেন—নিশীথ কি আমার পেশাদার ছবি-ওয়ালা যে এঁকে দাও বল্লেই দেবে? ও-র যাকে ভাল লেগেছে—তারই একটা ছবি এঁকেছে। নিশীথ বলিয়াছিল—বল-ত কাকীমা!

আজও একথাটি সীতা ভুলে নাই, আমরণ ভুলিবে না। কিন্তু এত বড় সুখের সংবাদটি মনে পড়িতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত্তের জন্য। তখনি সংযত হইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তার সঙ্গে তুলনা!

সীতা উঠিয়া পড়িয়া ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ একবার

আর্শিতে চেহারাটা পড়িতেই দেখিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। বস্ত্রাঞ্চলে কপালটি মুছিয়া ফেলিয়া সে পাখার বোতামটি নামাইয়া দিল। একমিনিট ঘূর্ণায়মান পাখাটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে পুনরায় সোফায় শুইয়া পড়িল। মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিল—এখনও ফিরছে না কেন? সুখন ত আসিয়া বলিল—বাবু দুপুরবেলা জবাব পাঠাইবেন!

দুপুরবেলা! কেন—সকালেই দু'ছত্র লিখিয়া দিতে পারিতেন না কি?

তখনি মনে পড়িল—একবার দু'ছত্র চিঠি আসিয়াছিল বলিয়া সে নিজেই ত রাগ করিয়াছিল। তাহার পর সাক্ষাৎ হইলে আধঘণ্টা কথাই কহে নাই। কিন্তু সে'দিন আর আজ! আজ যে একটি অক্ষরের জন্য সে লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। এ'টা ত তাঁহার বুঝা উচিৎ ছিল, আর সে ত স্পষ্টই লিখিয়াছে—যতক্ষণ না তোমার পত্রের উত্তর পাই, আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম। ইহার পরেও কি তিনি তাঁহার অটল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন! না, না, সে ত তাঁহাকে জানে—তিনি ত নিষ্ঠুর ন'ন।

আর যদি তাই হয়!—সীতা বারবার অধর দংশন করিয়া ভাবিতে লাগিল—যদি তাই হয়! তিনি কি আর তাহাকে পত্র দিবেন! সুখনকে একটা যা-তা বলিয়া বিদায় দিয়াছেন, তিনি কি আর সত্যই তাহাকে পত্র দিবেন! কখনই দিবেন না।

তাহার স্মরণ হইল, সে ছেলেবেলায় (তিন বছর আগে—এই তিন-বছরের ব্যবধান যেন তাহাকে প্রৌঢ়ত্ব দান করিয়াছিল) শকুন্তলা কাব্য পড়িয়াছিল। প্রত্যেক শ্লোকটি নিশীথ তাহাকে বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সব বুঝিতে না পারিলেও মোটামুটি গল্পটা আজও তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া আছে। বিশেষতঃ সেইখানটা, শ্লোকটি আজও ত সে ভুলে নাই—

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি !

বিচিন্তয়ন্তী যমনামানসা, নপোনিধিং চেৎসি ন মামুপস্থিতম্।

স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্, কাথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব্॥

(অর্থাৎ) আঃ এতই স্পর্দ্ধা ! অতিথিরূপে আমি উপস্থিত হইলাম, আমাকে তুমি উপেক্ষা করিলে! যাকে একমনে ভাবিতে ভাবিতে এই তপোনিধিকে অবজ্ঞা করিলে মদ্যপ নেশা কাটিলে যেমন নিজের উক্তি আর স্মরণ করিতে পারে না সে'ও তেমনি তোমাকে স্মরণ করিয়া চিনিতে পারিবে না।

তাহারও মনে হইতে লাগিল, সে-যখন একান্তমনে তাহার হৃদয়-দেবতার ধ্যান করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই কে-এক্ দুর্ব্বাসা আসিয়া তাহাকে অভিশাপ দিয়া গেল। পুণ্যবতী তাপস-কন্যা শকুন্তলার সখী দু'টি তাহার শাপ বিমোচনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ত অভাগিনী, তাহার শাপ কে মোচন করিবে? তিনি ত জাহ্নবী-অন্ত প্রাণ! তিনি কি জাহ্নবীকে অবিশ্বাস করিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। আর, তিনি শ্বশ্রূ—গুরুজন মাতৃতুল্যা—তাহা স্বত্বেও এ কথা ত সীতা ভুলিবে না যে এ অনর্থের মূল তিনি!

সে শুনিয়াছিল, সীতার বিবাহের পূর্ব্বে তাহার শাশুড়ী পুত্রকে লইয়া লাহোরে এক সম্পর্কীয় [illegible] কাছে থাকিতেন। পুত্রের বিবাহ দিয়াই কলিকাতার বাটীতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। সীতা ভাবিতে লাগিল—আবার কেন তিনি লাহোরেই গেলেন না? সেখানে ত এই তিনটি প্রাণী সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। সেখানে কোন কালে ত কোন জাহ্নবী তাহার পরিপূর্ণ সুখে বিঘ্ন হইত না।

সীতার ভাগ্য

খুট্ করিয়া কি একটা শব্দ হইতেই সীতা দরজার মোটা পর্দ্দাটি একটু ফাঁক করিয়া দেখিল—কে ?

বালক-ভৃত্য ছিদাম পাখীর খাঁচা সাফ্ করিতেছিল আর গুণ্ গুণ করিয়া কি-একটা গানের ছুইটি চরণ আবৃত্তি করিতেছিল—সীতা বাহিরে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল—তোর বড্ড বাড় বেড়েছে, ছিদাম।

ছিদাম শুষ্কমুখে কহিল—আমি ত খানিক আগে এসেছিলুম, সাফ্ করবার লেগে,—মা যে তখন মানা করলে, আমি কি করব, দিদিমণি !

আমার মাথা করবি, আর মুণ্ডু করবি—বলিয়া সীতা ঘরে ঢুকিল। ছিদামকে এমন একটা কাজ করিতে বলিয়া আসিল যাহার অর্থ শ্রীমান শ্রীদাম ত করিতেই পারিল না, আর সে নিজেও ঘরে আসিয়া নিজের কথার বিষে যেন জর্জ্জরিত হইয়া দু'টি হাতে চক্ষু ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল।

মেয়েমানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ছুই অবস্থাতেই কাঁদিতে পারে। সীতা শুইয়া ভাবিল—তাহার আর কি সম্বল আছে—কান্না ভিন্ন !—কথাটা মনের মধ্যে গেল কি গেল-না, লাল করতল দু'টি ভিজিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সে কাঁদিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে একবার মনে হইল—যতটা সে ভাবিতেছে, সত্যই হয়ত ততটা ভয়ের কারণ হয় নাই। জাহ্নবী যতই প্রলোভন দেখাক্, যতই টানুক—তিনি মানুষ ত ! তিনি কেন টলিবেন !

তখনি মনে পড়িল, তিনি ত টলিয়াছেন ! বেহারী ত মিথ্যা বলে নাই। কেন সে মিথ্যা বলিবে ! সে ভুল বুঝিয়াছে, বেশ তাহাই যদি হয়—তিনি ত কই শালের কথাটা তাহাকে বলেন নাই ! একজন পরস্ত্রী—যুবতী, যতবড় আত্মীয়াই হোক—তাহাকে অন্ধকারে গাড়ীর মধ্যে শাল

ঢাকা দিয়া বসিলেন, শালখানি তাহারই গায়ে দিয়া নামাইয়া দিলেন, ফিরিয়া সে কথা তাহাকে বলিলেন না-কেন? সে ত কোন কথাই তাঁহার কাছে গোপন করে না—একটি বর্ণও না। তবে তিনি তাহার সহিত কেন এমন ব্যবহার করিলেন!

বিবাহের অল্পদিন পরে কনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোমার এই নিশীথ দা'টিকে তুমি ভালবাস, সীতা।

সে বলিয়াছিল—বাসে।

কনককে রাগ করিতে দেখিয়া সে উত্তর দিয়াছিল—আর বাসব না। কনক হাসিয়া বলে—কেন বাসবে না, সীতা? সে কি উত্তর দিয়াছিল, জান? সে বলিয়াছিল—বাসব। তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব—তোমাকে সেই রকম ভালবাসব; আর সে আমার ভাই, বিদ্যাশিক্ষায় গুরু—তা'কে সেই রকম বাসব।—এ কথায় কনক সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

বেশী বয়সের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়া না-কি অনেক বিবেচনা তর্ক-বিতর্ক করিয়া মরে, সে ত একেবারেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই সে হাসিমুখে ত্যাগ করিয়াছিল! সে যে কোনদিন লেখা পড়া শিখিয়া, অথবা ধনীকন্যার গর্ব্বে এতটুকু স্বাধীনতাও চাহে নাই—সে কিসের জন্য? সে কি কনকের জন্যই নহে! তাহার চেয়ে কামনার, তাহার চেয়ে গর্ব্বের, তাহাপেক্ষা সুখ ঐশ্বর্য্যের কি আছে? আর সে কি তাহাই হারাইতে বসিয়াছে! কেন? কি অপরাধে সে এত বড় শাস্তি পাইবে? ভালোবাসায় যদি সার্থকতা, পূর্ণতা থাকে, তবে ত সে অগাধ ভালোবাসাই ঢালিয়া দিয়াছিল, হৃদয় ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল—আর পাইয়াও ছিল, তবে আবার এ শাস্তি তাহার কেন হইল? সে ত

সমস্তই পাইয়াছিল, পাইয়া তাহার নারী জীবন ধন্য হইয়াছিল, অকস্মাৎ এ বিনামেঘে বজ্রাঘাত তাহার মাথায় কেন হইল? হারাইবে না বলিয়াই সে যে অন্যের দুরধিগম্য স্থানে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই হারাইতে বসিয়াছে।

জগতে নারীজন্মের সেই অমূল্য সার্থক সম্পত্তি যদি হারায় তবে রহিল কি? তাহার সব গেল—কি লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে!

হঠাৎ সেই স্বপ্নটা মনে পড়িয়া গেল। আর একবার একটা স্বপ্নও সত্য হইয়াছিল, ইহাও কি তেমনি সত্য হইয়া যাইবে? হায় হায়! কেন সে এ স্বপ্ন দেখিল! সে-কেন দেখিল না যে সে কনকের কোলে মাথা দিয়া মরণের পথে চলিয়াছে। সে-যে ইহার চেয়ে ভাল ছিল, সে হইলে যে সীতা বাঁচিয়া যাইত!

মাত্র একটি বৎসর সে তাহাকে পাইয়াছিল—এ পাওয়াটা খুব বেশী দিনের পাওয়া নয়! কিন্তু ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে কেমন একটা পরিপূর্ণ শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিল। তাহার স্বামী যে তাহার কাছে কিছুই চাহিতেন না—তাহাতে নারীহৃদয় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাঁহার চাহিবার শক্তি নাই জানিয়া সে যে অম্লানমুখে সর্ব্বস্বই সেখানে ন্যস্ত করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিল! যে স্বামী নিজের স্ত্রীর কাছেই মুখ ফুটিয়া আকাঙ্খা জানান নাই—তিনি যে কখনও অন্য রমণীর প্রণয় ভিক্ষা করিবেন—এ'ও যেন তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উমাসুন্দরী সবই জানেন।

কনক আফিস চলিয়া গিয়াছে—উমাসুন্দরী নিজের ঘরটিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতে সীতার পত্রখানি; নিকটে একখানি মহাভারত খোলা পড়িয়া আছে, অদূরে একটি দোয়াত ও কলম পড়িয়া; একখানি সাদা কাগজের উপর শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় লেখা। তিনি সীতার পত্রের উত্তর দিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু কি উত্তর দিবেন—তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সুখন সকালে এই চিঠি লইয়া আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ সে কনকের জন্যও একখানি আনিয়া ছিল—উমাসুন্দরী তাহাকে কনকের ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। প্রবল ইচ্ছা স্বত্বেও কনককে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কনক যখন আহার করিতে বসিয়াছিল, তখন ইচ্ছা ছিল জিজ্ঞাসা করেন। পুত্রের সম্মুখীন হইতেই মাতৃহৃদয়ে অভিমান জন্মিল—পুত্র কেন কথাটা গোপন করিবে! কি ন্যায়সঙ্গত কারণ তাহার আছে? কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কনকের মুখ হইতে একটি কথাও পাইলেন না! অভিমান বর্ষনোন্মুখ হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে কনক দুধের বাটিটা উল্টাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

উমাসুন্দরী কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কনক বাহিরে গিয়া পাচককে তিরস্কার করিল—দুধে মাছি পড়িয়াছে, রাস্কেলটা দেখিয়া দেয় না কেন ইত্যাদি! উমাসুন্দরী সজল নেত্রে দেখিলেন—পাতে একটা মৃত মাছি পড়িয়া আছে! সজ্জিত ফলের টুকরা যেমন তাঁহার কাছে ছিল, তেমনি

পড়িয়া রহিল। উমাসুন্দরী সেই চেঙারিটার পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন! এ দোষ ত তাঁহারই! তিনি কেন নিজে দেখিয়া দিলেন না। এ কাজটি ত তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর সময় হইতে তিনিই করিতেন—অসাবধান জ্ঞানে কোনদিন সীতাকেও সে ভারটি দেন নাই!

অভুক্ত থালাটা দুধের বাটিটা মিলিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লেপিয়া মুছিয়া দিতে লাগিল! তিনি না পারিলেন, সেখান হইতে উঠিতে, না পারিলেন পুত্রকে পুনরাহ্বান করিতে!

চোখের জল মুছিয়া ফেলিতে যে কত সময় গিয়াছিল, তাহা কনকের ঘরে গিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন। কনক চলিয়া গিয়াছে,—খাটের উপর তাহার ত্যক্ত বসনখানি, ফ্লানেলের জামাটি পড়িয়া আছে—কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিলেন। নির্জ্জন গৃহ যেন তাহাকে আমূল বিদ্ধ করিতে লাগিল।

পাচক ভৃত্যবর্গ সকলেই বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট ধ্বনি শুনিয়া উমাসুন্দরীর মনে হইল—তাহারা যেন সেই আলোচনাই করিতেছে, যেটি তিনি ভয় করেন। জটলাটা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলেই যেন তিনি বাঁচিতেন—কিন্তু সে-যে কত দুর অসাধ্য তাহা বুঝিলেন, যখন বহুকষ্টেও মধুকে কোনমতেই ডাকিতে পারিলেন না।

আহারে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না। একমাত্র পুত্র অর্দ্ধাশনে উঠিয়া গিয়াছে—তিনি কোন্ প্রাণে আহারে বসিবেন। তখনি মনে হইল, না, তাহাতে কনকের অমঙ্গল করা হইবে—কোনমতে মালসাটা পাতে ঢালিয়া বসিলেন। কিন্তু আতপতণ্ডুলের পিণ্ডাকার অন্ন আজ আর গলায় নামিতে চাহিল না। বাম হাতে দুধের বাটিটা সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন।

বারবার এই কথাটাই তাঁহার বক্ষ মথিত করিয়া উঠিতে লাগিল—যাহার উপর তিনি সমস্ত বিশ্বাস নিশ্চিন্তমনে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সে-ই উদ্যত ফণা তুলিয়া তাঁহাকেই দংশন করিতে আসিয়াছে! কিন্তু যতবারই ভাবিতে লাগিলেন—সেই উদ্যত-ফণা বিষধরকে তিনি কোনমতেই দোষী করিতে পারিলেন না।

তাঁহার চেয়ে বেশী কে-জানে ইহা অস্বাভাবিক হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে! বিরল হইলেও ঘটনাটি যে একেবারেই অভূতপূর্ব্ব বা অচিন্ত্য তাহা নহে—তিনি ত এমনই দু'একটা চরিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সফলও হইয়াছন। একসময়ে তাঁহার রচিত চরিত্রগুলি যে দেশময় সর্ব্ব প্রধান আলোচ্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা ত তিনি জানেন! কে-ই বা না-জানে! সারা দেশটায় যে একটা নতুনত্বের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল—তাহাতে তাঁহার কবি-চিত্ত কি গভীরভাবেই না সুখানুভব করিয়াছিল।

তবে এ কি তাঁহরই স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফল! এ কি তাঁহারই কল্পিত অমৃত হ্রদের জলোচ্ছ্বাস তাঁহাকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে? তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তবে কি তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—কেবল নূতনত্ব সৃষ্টির আশায়? তৎসঙ্গে কি তাঁহার হৃদয়ের যোগ ছিল না? ছিল বৈ কি!—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। হৃদয়ের যোগ না থাকিলে কি সে-সকল চরিত্র ফুটিত, না লোকে তাহা সাদরে গ্রহণ করিত!

এই যে ব্যাপারটা—এ-যেন তাঁহারই সংঘটিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে-কি যেমন তেমন মনে হওয়া! তিনি-যে কোন কথা না ভাবিয়াও রাত্রে কনককে একাকী তাহার সঙ্গেই পাঠাইয়াছিলেন, মা হইয়াও এত

বড় একটা নিদারুণ সুযোগ দিয়াছিলেন—এ কথা মনে হইতেই হৃদয় যেন কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল।

অনুশোচনায় চিত্ত ভরিয়া গেল। সীতাকে তিনি তিরস্কার করিতেন—কিন্তু তাঁহারই স্নেহতলে, বিরলে বসিয়া আরেকজন যে তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিতেছিল—এ ত তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আজ মনে হইতেছিল যদি সীতা তাঁহাকে খুব তিরস্কারও করিতে আসে, তিনি একটি হাঁ-ও করিতে পারিবেন না।

আহতস্থানটাই যেমন কেবলি মনে পড়ে, উমাসুন্দরীর কবি-মন কেবল এই কথাটি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একটি গল্প শুনিয়াছিলেন—তাহাও মনে পড়িল। একটি মহিলা ছোট গল্প পড়িতে ভাল বাসিতেন। বিশেষ করিয়া কোন একটি লেখকের গল্প পাইলে তাঁহার আহার নিদ্রার কথা মনে থাকিত না। ঐ মহিলাটি চির-অসুস্থ ছিলেন, সারাদিন বিছানায় পড়িয়া তিনি কেবল গল্প উপন্যাসই পড়িতেন। তাঁহার স্বামী ভাল গল্প উপন্যাস বাহির হইলেই সযত্নে স্ত্রীকে পড়িতে দিতেন। আর ডাক্তারেরা ও নাকি উপদেশ দিয়াছিল তাহাতে সুফলের সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে মহিলাটির প্রিয় লেখকের একটি গল্প অনেকদিনের পর পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে দেখিয়াই স্বামীটি একখণ্ড পত্রিকা এনে স্ত্রীকে দিলেন। মহিলাটি কাগজ নিয়ে সূচীতেই দেখিলেন—তাঁর গল্প বেরিয়েছে। বলিলেন—অনেকদিনের পর····· র গল্প বেরিয়েছে! তাঁর মুখের হাসিটি দেখে স্বামী বড়ই আরাম পেয়েছিলেন—চিররুগ্না হ'লেও স্ত্রীকে ভালোবাসার তাঁর অন্ত ছিল না। স্বামী বেচারা জানিতেন না যে তাঁহার স্ত্রীর অধরে এই হাসিটুকু এ-জীবনের মত শেষ

হাঁসি! তাঁর মনে তখন অসীম তৃপ্তি বিরাজ করছিল যে তিনি তার প্রিয় সামগ্রী আনিয়া দিতে পারিয়াছেন। স্বহস্তে ঔষধ খাইয়ে তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—তুমি পড়—আমি শুনি। স্ত্রী কোমলকণ্ঠে গল্পটি পড়তে লাগ্‌লেন; মাঝে মাঝে একটু থামেন, চোখের জল মুছেন, আবার পড়েন। যখন পড়া শেষ হ'ল—তিনি চীৎকার ক'রে শুয়ে পড়লেন। স্বামী আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে স্ত্রীকে ধরতে গিয়ে দেখ্‌লেন—একেবারে নিস্পন্দ। ডাক্তার এল—তখন জীবন নিঃশেষ হইয়া গেছে। ডাক্তাররা গল্পটিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। স্বামিটি অনেকদিন অবধি লেখকের সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু লেখক বেচারার বরাত ভাল—তিনি থাক্‌তেন তখন বিলাতে! অনেকদিন পরে লেখক ফিরলে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করে' কাঁদতে কাঁদতে এ'টি বলেছিলেন।

উমাসুন্দরী ভাবিতে লাগিলেন—সে লেখক কি ভেবেছিলেন, তাঁর সেই গল্পটি পড়ে কারো এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটতে পারে, নিশ্চয়ই ভাবেন নি। কিন্তু তিনি ত ইহা ভাবেন নাই—একথা বলিতে পারিবেন না। ভাবিয়াছিলেন বৈ কি! অতি সঙ্গোপনে—হৃদয়ের হৃদয়ে ভাবিয়াছিলেন। এবং যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর কেহ না জানুক তিনি ত জানেন, হঠাৎ সেবার তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের বাতিক ধরিয়াছিল কেন! দু'টি মাস ধরিয়া তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবীও যাইতে চাহিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন—তা কি হয় মা, তোমাকে যে শ্বশুর ঘরই করতে হ'বে।—জাহ্নবীও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কনকও দ্বিধা করে নাই—সে মায়ের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরিয়া লাহোর মেডিক্যাল কলেজেই পড়িতে লাগিল।

পাঁচ বৎসর পরে উমাসুন্দরী পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। নিজে দেখিয়া এবং সবান্ধব কনককে মেয়ে দেখাইয়া সীতার বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনও ত কিছুই বুঝা যায় নাই।

বিচার করিতে হইলে না হয় স্বীকার করা গেল যে, জাহ্নবী স্ত্রীলোক—সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ করিল, কিন্তু কনক! সে ত উচ্চশিক্ষিত, হৃদয়বান, তাঁহারই পুত্র—সে কি বিবাহিতা রমণীকে হৃদয়ে পুরিয়া আর একজনকে বিবাহ করিয়া ভালবাসার ভাণ করিয়াছিল? তাহাই বা হয় কি প্রকারে! সীতার সম্বন্ধে কনক কখনও বাড়াবাড়ি করে নাই—বলিয়া একদিকে যেমন তাঁহার স্বস্তি ছিল, সীতা নিজের অধিকারটি দৃঢ় করিয়া লইতে পারিতেছে না বলিয়া তাঁহার বিরক্তিও অল্প ছিল না। কোনোদিকে একটা ভয় ছিল বলিয়াই তিনি মা-হইয়াও এই দাম্পত্য-জীবনের গভীরতার মাপ পরিমাপ করিতে যে একদিন উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিলেন, নিদারুণ লজ্জার বিষয় হইলেও, এইটিই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

কনক হেলাগোছা ধরণের বলিয়া তিনি আরও বেশী করিয়া আশা করিতেন—বধূ তাহাকে গাঢ় করিয়াই পাইতে পারিবে, তাহারই ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি সীতার প্রতি অনেক সময় প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। কত বাসনা বেদনা গোপন করিয়া কি দুঃখে কষ্টেই না তিনি কনকের বধূর উপর রূঢ় কথা কহিতে পারিয়াছেন—সে-সংবাদ ত অন্তর্যামীর অজ্ঞাত নাই।

আরও একটি কথা তাঁহার স্মরণে আসিল—কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া জাহ্নবীকেও ত তিনি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিতে পারেন নাই। উপন্যাসের কথাটা তখন মনেই ছিল না,—থাকিলেও বাস্তব জীবনে তাহার ছায়াপাত না দেখিয়া তিনি ত ক্ষুণ্ণ হ'য়েন নাই বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত।

তবে কি মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন? মিথ্যা নহে—কনকের আচরণ, যে'টি তিনি ভাবিতেও অক্ষম—সেইটিই ত তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিতেছে। তার উপর সীতার এই পত্রখানা।

সীতাও ঠিক এই সন্দেহ-ই করিয়াছে। নহিলে একথা সে লিখিবে কেন? পত্রখানি হাতে লইয়া তিনি সেই একটা ছত্রই বারবার পড়িলেন। "মা, আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক, আপনাদের কাছ ছাড়া হইয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না—আমার মনে নানা শঙ্কা হ'চ্ছে।" সে লিখিয়াছে—মা আপনার অভাগিনী সীতা যদি আপনার পদতলে আশ্রয় লইতে চায়—আপনি কি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন?

উমাসুন্দরীর কপোল বহিয়া কয়েকবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন—সীতা অনেক দুঃখেই সে কথা লিখিতে পারিয়াছে! তাঁহারই নির্ম্মম কঠিন ব্যবহারটি স্মরণ করিয়া হয়ত সে এ বাড়ীতে আসিতে পারিতেছে না, কিন্তু তাহার ভয়াকুল, নিদারুণ নিরুপায় অবস্থাটি উমাসুন্দরীর মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেই স্বামী-স্নেহে সন্দিহান কিশোরী বধুর ব্যথাতুর মুখখানি কল্পনা করিয়া উমাসুন্দরী কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না।

পাছে এই চোখের জলটা লোকের চোখে পড়ে, উমাসুন্দরী কতবার মুছিয়া ফেলিলেন—কিন্তু সে-ত চোখের জল নয়, যে মুছিলেই যাইবে। সে-যে তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানা গলিয়া উৎস আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়?

কলম তুলিয়া লইয়া তিনি পত্র লিখিতে বসিলেন, পারিলেন না। চোখের জলে দৃষ্টি লুপ্ত হইল, হাত কাঁপিতে লাগিল—কলম ফেলিয়া তিনি চোখের চশমা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

গোয়েন্দাগিরি।

অপরাহ্নের দিকে মাণিকলাল জামাটি গায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছিল, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে জাহ্নবী সম্মুখে আসিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছ ?

মাণিকলাল একটু বিস্মিত হইল। জাহ্নবী যে এই দুইদিন দূরে থাকিয়াও তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে, তাহা সে জানে, কিন্তু সে যে একেবারে সামনে আসিয়া পথরোধ করিবে এ ধারণা তাহার ছিল না। একটু ভাবিয়া জবাব দিল—বেরুচ্ছি।

তা জানি—কিন্তু কোথায় যাচ্ছ—তাই জান্‌তে চাই।

সে'টা আমিও বুঝতে পারছি না-যে তা নয়, কিন্তু কেন ?

কেন আবার কি—জান্‌বার কি দরকার নেই ?

মাণিকলাল হাসিয়া বলিল—সব দরকার নাই বা মিট্‌ল ? আর সবই কি মেটে ?

জাহ্নবী দৃঢ়স্বরে বলিল—তা জানিনে। কার কতটা দরকার, কতটা মেটে তা আমার জানা নেই। তবে এটা নিশ্চয়ই যে ঠিক দরকার বলে যতটুকু আশা করা যায়—তা মেটে।

মাণিকলাল কি ভাবিল, একটু পরে বলিল—তা মেটে না, জাহ্নবী, এটা আমিও যেমন জানি, তুমিও তেমনি জান।

জাহ্নবী স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রসঙ্গটা এইখানে চাপা দিতে পারিলেই

যে শুভ হইত, তাহা সে-ও জানিত, কিন্তু আজ সে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল—আজ আর গোপনতাকে প্রশ্রয় দিয়া তুষের আগুণের জ্বালা বাড়াইবে না। দুইমিনিট পরে বলিল—কি আমি জানি?—আর সে মুখের পানে চাহিতেই পারিল না। কথাটা বলিয়া নতমুখে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বুঝি, পূর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ কঠিনস্বরের জন্যই সে প্রস্তুত হইতেছিল।

মাণিকলাল ফিরিয়া গিয়া বিছানায় বসিল; বলিল—আজ তোমার ভাজের বাড়ী তত্ত্বের ব্যাপারটা শুনেছ কি?

জাহ্নবী জবাব দিল না, মাণিকলাল বুঝিল, সে জানে। বলিল—যখন জান, তার কারণটি তোমার অজ্ঞাত নেই।

জাহ্নবী মুখ না তুলিয়াই বলিল—কি কারণ?

মাণিকলাল আশ্চর্য্য হইয়া এক মিনিট তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুঝি এত বড় বিস্ময়ের মধ্যে সে আর কখনও পড়ে নাই। কি বলিবে তাহাই ভাবিয়া লইতেছিল, হঠাৎ জাহ্নবীর কঠিন কম্পিতস্বরে তাহার চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়াগেল,—চুপ্ করে রইলে কেন?

মাণিকলাল আস্তে আস্তে বলিল—পথ ছাড় জাহ্নবী, আমি যাই।

এবার সে মুখ তুলিল। ঘাড়টি বাঁকাইয়া, মৃদু অথচ কঠিনকণ্ঠে বলিল—তোমাকে আমি ছাড়ব না।

মাণিকলাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহস্যচ্ছলে বলিল—আটকাতে চাও—কেন? আমাকে নিয়ে কি করবে জাহ্নবী!

কি করব! তোমাকে……

মাণিকলাল বাধা দিল, সহজভাবেই বলিল—শোন, জাহ্নবী, পথ ছেড়ে দাও—বনের মানুষ বনে যাই।

জাহ্নবী বলিল—তাই বল যে যেতে চাও। কিন্তু আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কি পৌরুষত্বে যেতে চাইছিলে, শুনি? কথাটা এখনি এমন ভাবে বল্লে যেন পাপ……

মাণিকলাল দাঁড়াইয়া উঠিল, একটু চড়া গলায় বলিল—পাপ পুণ্যের কথা তুল না তুমি।—বলিয়া সে উঠিয়া দ্বারটি অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। জাহ্নবী ফিরিয়া চাহিতেই বলিল—তোমার আমার কথা আর কেউ যত না শোনে, ততই মঙ্গল। বুঝেছ—বলিয়া সে বিছানায় ফিরিয়া গেল।

জাহ্নবীর সাদা রক্তশূন্য মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—জাহ্নবী! শুন্‌বে কথাটা! কিন্তু না শুন্‌লেই ভাল হ'ত।

জাহ্নবী আবেশময় চোখ্ দু'টি তুলিয়া চাহিল মাত্র—কিন্তু কণ্ঠ তাহার অসাড় হইয়া গিয়াছিল, কথা বলিতে পারিল না। ডানহাতে খাটের বাজুটা ধরিয়া দাঁড়াইল।

মাণিকলাল বলিল—একথা কোনদিন শুন্তে পেতে না জাহ্নবী, অন্ততঃ আমার কাছে পেতে না। এই মাতাল, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য লোকটার কাছে সব রকম অত্যাচার অনাচার পেতে পার—সেটি পেতে না।—একটু থামিয়া আবার বলিল—তাই বল্‌ছি—পথ ছাড়।

জাহ্নবী নড়িল না, একটু একটু করিয়া পাংশু মুখখানা তুলিল। কিন্তু হাঁ না কিছু বলিবার পূর্ব্বেই শুনিল, এ-যে কত বড় প্রলোভন, কত বড় আকর্ষণ তুমি ত্যাগ করছ—একি একা তুমিই জান? আর আমি জানি না। এ-যে এমন একটা জিনিষ জাহ্নবী—যা ঠিক এইখানটায় বাজে। সে-যে আমার সেইদিনই বেজেছিল, যেদিন বেশ সহজভাবে চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে কনকের সামনে থেকে সরে গেলে। কেন

তুমি কি তাঁর সামনে বেরুতে না কোন দিন? হঠাৎ একেবারে হিন্দুঘরের কুলের লক্ষ্মী হ'য়ে আড়ালে লুকুলে কেন বল্‌তে পার? তারপর, সেইদিনই কনকের থাবার কথাটা……

জাহ্নবী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এক ফোঁটা অশ্রুও এই দুঃখে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল না।

মাণিকলাল থামিল। ইচ্ছা হইল, হাতটি ধরিয়া তুলিয়া লয়। কিন্তু কি-ভাবিয়া উদ্যত হস্ত ফিরাইয়া লইয়া বলিল—বুঝতে পারছ সবই আমার জানা আছে?—বলিয়া সে স্থিরভাবে চাহিয়া রহিল।

বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হইল না; জাহ্নবী মুখ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বলিল—সবই যদি জান—এ'ও ত জান যে……

কথাটা উচ্চারণ করা যে কত শক্ত, এহেন সময়েও তাহার গলা দিয়া একটি শব্দ বাহির করিতে পারিল না—এই দুঃখে, ক্ষোভে সে আবার মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মাণিকলাল বলিল—সব আমি জানি। শাল হ'তে আরম্ভ করে' কনকদের বাড়ী থেকে রাত দুপুরে ছেলে কাঁদবার ছল তুলে……

জাহ্নবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—ছল করে?

মাণিকলাল কিন্তু অচল অটল। সহজসুরেই বলিল—কথাটা কি এতই শক্ত লাগ্‌ছে জাহ্নবী? ভেবে দেখ দেখি—সে'টা কি ঠিক ছলই নয়?

জাহ্নবী বলিল—না ছল নয়! বল তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করি… বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

শোন, আমি বল্‌ছি। তুমি বল্‌বে—ছল করে' আসনি, তোমার ভয় হ'য়েছিল—তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে শান্ত কান্নাকাটি করছে—এইটে মনে

করাই স্বাভাবিক হ'ত, যদি না—তোমার আপনার জনই একথা ভাবতেন।

আপনার জন ?

মাণিকলাল গম্ভীরভাবে বলিল—এই দেখ, সীতাকেই ধর। সে-যে কাণ্ডটি করেছে শুনেছ ত—সেকি অগ্নি অগ্নি করেছে ? তার অনেক বেশী জামা সেমিজ আছে—সে বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বৌ বলে'—ঐ রকম করেছে ? হয়ত, তাই কেন, নিশ্চয়ই তা'র অনেক সুট আছে—তাই বলে সে-কি তোমার দেওয়া সাধের দ্রব্যাদির এমন ব্যবহার করত—

জাহ্নবী কাঁদিতে কাঁদিতে মাণিকলালের পায়ের কাছে লুঠাইয়া পড়িয়া বলিল—তুমি যাও।

মাণিকলাল ত্রস্তে পা সরাইয়া লইল, খাট্ হইতে নামিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল—রোগজীর্ণ, অবসন্ন নিঃসম্পর্ক আমাকে থাকতে দিতেও অনিচ্ছা তোমার ? পাপ পুণ্যের কথা ছেড়ে দাও—সে আমরা কেউ ভুলতে পারি নে।

ঘন অমাবৃতা রজনীতে প্রান্তরে দিকভ্রান্ত পথিকের মতই এক নিমিষের একটি আলোকপাতে জাহ্নবী মুখ তুলিল ;—পরমুহূর্ত্তেই আলোয়ার আলোর মতই শঙ্কিত হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

মাণিকলাল বলিল—কাল ঠিক এই কথাটা কনকের মা'কেও বলে এসেছিলাম।

প্রাণদণ্ড শুনিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কাঠগড়ার মধ্যে আসামীর যে অবস্থা হয়—ঠিক সেই অবস্থাতেই জাহ্নবী উদাসভাবে চাহিয়া রহিল, একমুহূর্ত্ত পরে স্বকর্ণে যখন শুনিল যে প্রাণদণ্ড ! কথাটা কাণে পৌঁছিতেই সামনের গম্ভীরমূর্ত্তি বিচারকের পানে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল—অতদূর গোয়েন্দাগিরি করেছ ! তুমি—মানুষ !

কিন্তু এত বড় আঘাতটাও মাণিকলাল সহ্য করিয়া লইল। অম্লান-কণ্ঠে বলিল—গোয়েন্দাগিরি? তা বৈ-কি! আমার মতন উড়োনচণ্ডে ছন্নছাড়া মাতালটারও বুকের মধ্যে একটা ভাতের হাঁড়ী ফুটতে লেগেছিল—তেমনি করে ছুরী দিয়ে কে যেন আমার বুকের থানটাকে ফাড়তে সুরু করে দিয়েছিল।

একটু থামিয়া, আরও নরমসুরে বলিতে লাগিল—অথচ যে জিনিষটার দরকার বুঝিনি, যা আমি চাই-ও নি। বাড়ীতে আসতুম মাঝে মাঝে এক আধ দিন—কিন্তু তোমাকে দেখবার ইচ্ছে-ও ত হ'ত না। একটা যে জিনিষ আছে—মানে এই স্ত্রী-জিনিষটার যে অস্তিত্ব আছে তা ত জানতুম—কিন্তু চাইতুম না। আশ্চর্য্য! আর ঠিক যখন শুনলুম যে সেই জিনিষটা আরেকজনের অধিকার—যেমন তেমন অধিকার নয়—একেবারে গাঢ়—ভারি আশ্চর্য্য! অমনি বুক্‌টা ধড়াস্ করে উঠিল।—যেন কি-একটা মহা সর্ব্বনাশই তার হ'য়ে গেছে।

জাহ্নবীর শুষ্ক চোখদু'টির পানে চাহিয়া মাণিকলাল বলিল—আচ্ছা কেন এমন হয় বল্‌তে পার? থাক্‌গে—ভারি ত কথা, ওর আবার বলাবলিরই বা দরকার কি! কিন্তু সত্যি বল্‌ছি—তা'র চেয়েও বড় আশ্চর্য্য দেখলুম কি জান? মনে কর সে একটা গল্প। দেখ্‌লুম, সেই স্ত্রী-প্রণয়ী কি করছে?—একটি হাত, যেটি তার সেবার হাত, যেটি তার রমণী-কোমল হাত সেটি বাড়িয়ে দিয়েছে স্বামীর দিকে; আর একটি হাত·····

জাহ্নবীর কাণে কে-যেন তপ্ত লৌহশলাকা ঢুকাইয়া দিতেছিল—দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল। স্খলিত আর্দ্র স্বরে বলিল—ওগো আর বল-না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

মাণিকলাল বলিল—তাহার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল—সেবার হাত-টি কি সেবাই করলে, প্রাণ ঢেলে, আর একটা হাত ছেলেবেলাকার খেলাঘরে বর বৌ খেলা করছে। যে-স্ত্রীর হাত-টা সেবা করছিল, অন্য হাতটা যেন তারি নয়।

সে থামিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল—তা'ও দেখলুম, লড়াই-টা। একটি ছোটখাট German war বুঝলে? দেখে আর কিছু না হোক—মাতালের নেশাটা বেশ একটু রঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌ল—একেবারে চম্‌চম্‌ ঝম্‌ঝম্‌—

জাহ্নবী সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

মাণিকলাল বলিল—কে কি করত না-করত, কে কি বল্‌বে না-বল্‌বে, কে কি মনে করছে—সব জান্‌বার দরকার হ'য়ে পড়্‌'ল। তোমার কথাটাই ঠিক জাহ্নবী—তুমি ঠিকই বলেছ—ঠিক দরকার বলে যতটা আশা করা যায়—তা মেটে। তোমার সম্বন্ধে ঠিক যেটুকু আশা করেছিলুম, তাই পেয়েছিলুম। এই আমার ন্যায্য-পাওনা—আজ বুঝেছি।

জাহ্নবী কি বলিতে গেল, মাণিকলাল তাহার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিল—বেহারী বল্লে শালের কথাটা; উমাসুন্দরীর কাছে বুঝ্‌লুম—তিনিও তাই—আর সেটিকে দেখলুম—একেবারে অস্থিচর্ম্মসার।

সেটি-যে কে বুঝিতে দেরী হইল না, জাহ্নবী ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসিল—অসুখ?

না, না শারীরিক কিছু নয়;—জিজ্ঞেস করতে হ'ল না—বুঝতেই পারলুম ভায়া আমার ভাবসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন।—বলিয়া মাণিকলাল হাসিল—হাসিতে হাসিতেই বলিল—একেবারে হাবু-ডুবু—হাবু-ডুবু।—সে অনেকক্ষণ ধরিয়া হা হা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই হাসি-টা প্রথম দিন হইতেই জাহ্নবী দেখিয়া আসিতেছে। হাসির সময় মুখের হাঁ দিয়াই যেন তাহার সমস্ত হৃদয়খানা সাফ্ দেখা যাইত—আজ কিন্তু অন্যরূপ মনে হইল। সাতিশয় দুঃখে-বিস্ময়ে ভাবিল—মাথা খারাপ নয় ত !

লোকটি যেন তাহাই বুঝিতে পারিয়াছিল, হাসি-টা থামাইতে থামাইতে বলিল—শেষাশেষি নাটকটা বিয়োগান্তই হ'ল।

জাহ্নবী স্খলিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি আমায় ত্যাগ করবে?—না—

মাণিকলাল একটুখানি নড়িয়া উঠিল, আবার তখনই স্থির হইয়া বলিল—না। ত্যাগ করব না।

জাহ্নবী হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

মাণিকলাল বলিল—ত্যাগ করবার কোন কারণই ত হয় নি।

হয় নি ?

আমি ত তাই জানি।—

এক মুহূর্ত্ত বক্তার মুখের পানে চাহিয়া জাহ্নবী যেন শ্বাস লইল; তারপর দুটি হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া, জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া বলিয়া উঠিল—ও গো তার বেশী কিছু নয়—এ তুমি বিশ্বাস কর।—বলিতে বলিতে চোখের জলে তাহার মুখখানি ভাসিয়া গেল।

মাণিকলাল তাহার মাথার কবরীর উপরে হাতটি রাখিয়া বলিল—আমি তা জানি, জাহ্নবী! না জান্‌লেও তোমায় ত্যাগ্ করতুম না। নিজের দৃষ্টান্ত ভেবেই তা করতে পারতুম না। এইবার বুঝেছ জাহ্নবী, আমি মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই।

জাহ্নবীর স্পন্দিত পিঠটার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে মাণিকলাল

পুনরায় বলিল—উঠে পড়, জাহ্নবী। লোকে আবার কি বল্‌বে! বলিয়া সে একটু মুচকি হাসিয়া দ্বার খুলিতে গেল।

জাহ্নবী বলিল—দাঁড়াও।

সে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি ছাড়া।

কনক অন্যদিনের চেয়ে একটু সকালেই ডাক্তারখানায় আসিয়া বসিল। চির প্রথামত হেড্ কম্পাউণ্ডার পূর্ব্বদিনের কালেকসানের টাকাটা ব্যাঙ্কে পাঠাইবার চালানাদি লইয়া হাজির হইল, চালানে একটা সহি করিয়াই তাহাকে বিদায় দিয়া, বলিল—আমাকে কেউ বিরক্ত করবেন না!

কম্পাউণ্ডার আশ্চর্য্য হইয়া বাহির হইয়া গেল।

কনক পকেট হইতে সীতার চিঠিখানি বাহির করিয়া খামটি খুলিয়া আর একবার পড়িবার চেষ্টা করিল। প্রথম কয়েকছত্র বেশ পড়িয়া গেল, তাহার পরেই, এত বড় একটা ডাক্তার, শিক্ষিত যুবক—হঠাৎ পত্রখানা মুখে ঢাকা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সেখানটা আর না পড়িলেও, কথা কয়টা বুকের মধ্যে তপ্ত কটাহে ব্যঞ্জনের মতই ফুটিতেছিল। সীতা লিখিয়াছিল—আমি সকলের কাছেই শুনতে পাই—প্রথমবার এ-সঙ্কটের

সময়ে কোন ডাক্তারই চোখের আড় করে না! আমার অদৃষ্টে কি সবই বিপরীত! নইলে তুমিই আমাকে আগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবে কেন? তুমি জান, তোমার তফাতে আমি যদি মরিও, তোমার তা'তে দুঃখ নাই।

কনক পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিল। শরতের আকাশের মত একই সঙ্গে—এক ঝলক রৌদ্র আর এক পসলা বৃষ্টি চোখে ফুটিয়া উঠিল।

সীতা লিখিয়াছে—যদি বল, আমি ত না এলেই পারতুম। হয়ত পারতুম। কিন্তু তখন ত আমি জান্তম না-যে এই যাওয়াই আমার শেষ।

কনক আর পড়িতে পারিল না। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল—শেষ যাওয়া! না, সীতা, শেষ যাওয়া নয়! তোমাকে আবার আমি নিয়ে আস্‌ব—বুকে করে রাখ্‌ব।

তখনি ভাবিল—উঃ কি কাণ্ড-টাই না হইত! সে বড়ই পরিত্রাণ পাইয়াছে! নিজের গুণে নয়, জাহ্নবীর গুণেই সে মুক্তি পাইয়াছে। সে পুরুষ, দৌর্ব্বল্য তা'র উচিৎ নয়—কিন্তু সে-ত তাই করিয়া বসিয়াছিল। ভাগ্যে জাহ্নবী সরিয়া গিয়াছিল, নহিলে কি আর রক্ষা ছিল!

সেদিন জাহ্নবীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া গিয়া কনক সারাদিনরাত্রি সেই কথাটাই ভাবিয়াছিল। কত বড় দুঃখে, দৈন্যে সেদিন সে মাণিক লালের ঘর হইতে আসিয়াই নিভৃতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল—তাহা ত সে জানে! তখনকার মত নিজের সঙ্গে সে জাহ্নবীকেও ধিক্কার দিয়াছিল—কিন্তু আজ আর পারিল না।

সীতার পত্রখানি খোলা রহিয়াছে, তাহারা ত একরকম ধরিয়াই লইয়াছে—যে বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই—কিন্তু জাহ্নবীই যে তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে—তাহা ত তাহারা জানে না!

তাহার মনে পড়িল—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষমতা থাকিলে মরণোন্মুখ যেমন সবলে একবার প্রিয়জনকে জড়াইয়া ধরিতে চায়, শবদাহ শেষে আত্মীয় স্বজন চিতাধৌত করিয়া সেই স্থানটিকে ব্যাকুল অন্তরে স্পর্শ করিয়া আসে—জাহ্নবীও ঠিক সেই রকমই মৃত্যু-ম্লান-মুখেই তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। নিজের মনের সঙ্গে তাহারও একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, জাহ্নবীর হৃদয়-দ্বন্দ্বটা যেন একেবারে প্রভাতালোকে ধরণীর মতই ঝলসিয়া উঠিল।

সকালে সীতার পত্র পাইয়া প্রথমটা তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সে-যে অন্যায় করিয়াছে,—সেই অন্যায়ের ফলে সীতাকে দুঃখ দিয়াছে—এ কথা ভাবিয়া সে ত জাহ্নবীকে অভিশাপ দিয়াছে, কিন্তু জাহ্নবীর হৃদয়ের এদিকটা ত তখন সে ভাবে নাই! মাতালের মত তাহার মনে বারবার ঐ একটা কথা ছাড়া আর কিছুই উঠে নাই—কিন্তু নেশা কাটিয়া গেলে সমস্ত ঘটনাটি যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন এ কথাটাও তাহার মনে হইল—জাহ্নবী তাহার পর হইতে যে তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে—সে তাহারই মঙ্গলের জন্য! সে নিজে ত ধরা দিয়াছিল, সে ভাবটা প্রবল থাকিলে কি দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকিত!

পূর্ব্বদিকে মৃদু বর্ণে অরুণোদয় হইয়া যেমন সমস্ত পৃথিবীটাকে আলোকিত করিয়া ফেলে—কনকের মনেও সবশুদ্ধ কাণ্ডটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—পাপ না হয় নাই ধরলুম,—সেন্টিমেন্ট্যালিটি, কিন্তু কি লজ্জাকরই না হইত! বিবাহিত পুরুষ হইয়াও—না, না, সে কথা আর ভাবিব না। ভাবি আর না-ই ভাবি কাজটি ত হইয়াই গিয়াছে। সীতা ত চমৎকারই লিখিয়াছে—আমার জীবনে স্বপ্ন যে চিরদিনই সত্য

হয় তা আমি তোমাকে বলেছিলুম। তুমি হেসেছিলে, কিন্তু সে স্বপ্ন যে তোমার হাতেই ফল্‌বে—তা আমি জান্তুম না।

বেশ লিখেছ, সীতা বেশ লিখেছ! চমৎকার! স্বপ্নটা তুমি বলেছিলে বটে! আমা হ'তেই তা ফল্‌ছে! ফল্‌তে যাচ্ছিল বৈ কি! সে-বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? ঠিক বলেছ সীতা—বনবাসেই তোমাকে আমি পাঠিয়েছিলুম।

কিন্তু না! মোহটা কেটে গেছে। বলিতে বলিতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

নহিলে কি আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিত।—সে কাঁচের স্বারটি ঠেলিয়া বাহির হইতে যাইবে, কম্পাউণ্ডার বাবু উঁকি মারিয়া বলিল—নেবুতলার সেই কেস্‌টা—

বলে দিন তা'দের, আজকের মত অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক্।

কম্পাউণ্ডার চলিয়া যাইতেছিল, কনক ডাকিয়া জিজ্ঞাসিল—কোন্‌টা বলুন ত!

কম্পাউণ্ডার বলিল—সেই যে বুড়ীটি আস্‌ত—তার ছেলেটির—

ও-হ। দেখুন—একখানা ট্যাক্সি ডাক্‌তে বলে দিন। অন্য ডাক্তার ডাক্‌তে তারা পারবে না।

কম্পাউণ্ডার চলিয়া গেল। কনক সেইখানেই দু'তিন মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল। সে শুনিল, বৃদ্ধাটি বলিতেছে—যাবেন বৈ কি বাবা। গরীবের মা-বাপ যে তিনি। এত বড় কলকেতাটার অলিতে গলিতে ডাক্তার—কার কাছে কেঁদে কেঁদে না গেছি। কেউ ত অনাথা বুড়ীকে দয়া করে নি বাবা। পেরথম দিন ত এত বড় ডাক্তারখানায় ঢুকতেই সাহসে কুলোয়

নি—তবু না ঢুকেও পারি নি। তখন আমার বড় বিপদ কি-না বাবা। আর সেই দয়াময় আমার বিপদ বুঝে—এত বড় ডাক্তারখানার ভেতরে আমার বাবাকে বসিয়ে রেখেছিলেন, এ কি আর আমি জানিনে।

প্রত্যেক কথাটা জ্যামুক্ত শরের মতই কনকের বুকের ভিতর প্রবেশ করিতেছিল। সে ত ডাক্তারী করিতই না, যা-ও বা করিত, আত্মীয় স্বজনদের গৃহে,—হাত যশও তাহার অল্পবিস্তর ছিল—অনেক রোগীকে সে মরণের পথ হইতেও ফিরাইয়া আনিয়াছে—কর্ত্তব্যজ্ঞানেই সে-সকল সে করিত, কিন্তু হৃদয়ের এতখানি আগ্রহ-ব্যগ্রতা আর কখনই সে অনুভব করে নাই। ডাক্তারদের দৌর্ব্বল্য শোভা পায় না—ডাক্তারের দৌর্ব্বল্যে রোগীর সমূহ বিপদ আছে—সেই হেতু কোন কারণেই যে ডাক্তারকে বিচলিত হইতে নাই—ডাক্তারী শিক্ষার সঙ্গেই কঠিনতার-শিক্ষাটা হইয়া যায়—কিন্তু আজ কনক বালকের মতই পুলক-বিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল—আহা! বুড়ীর ছেলেটিকে কি পারব না বাঁচাতে!

আজ দেখে আসি, কাল না-হয় Dr……কে কল দেব—এই চিন্তাটুকু করিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

বৃদ্ধা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার চোখে জল দেখিয়াই কনক কম্পাউণ্ডারকে বলিল—আজ আর ফিরব না আমি—বুঝলেন!

এস—বলিয়া সে ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সীতার ভাগ্য।

সীতার হৃদয়ের বিরোধতিক্ত হাহাকার দমিত করিয়া একটি চিন্তাই ফুটিয়া উঠিতেছিল যে দুপুরের মধ্যে কনকের চিঠি আসিয়া পড়িবে! মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ শরতের আকাশের মতই মেঘ রৌদ্রের খেলা জুড়িয়া দিয়াছিল। নিদারুণ হতাশ্বাসের সঙ্গেই যেন আশার একটি ক্ষীণ বাষ্পরেখা হইয়া উঠিতেছিল, সেটি এই—হয়ত কনকের চিঠিখানা তাহার সমস্ত জ্বালার অবসান আনিয়া দিবে! হয় ত সেই চিঠিটাই গভীর আনন্দের সহিতই তাহাকে জানাইয়া দিবে যে স্বপ্নে যাহা সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তাহার কোন ক্ষতিই হয় নাই—সবই ঠিক আছে।

কনক সত্যবাদী, সে-যে মিথ্যা বলিবে না—ইহাও যেমন আশান্বিত করিতেছিল, সেই রাত্রে জাহ্নবীর ছেলে-কান্নার ছলটা মনে করিয়া নৈরাশ্যে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এ-কথাটা সে ভাবিতে ভুল করিল না যে কনকের তাহাতে হয়ত কোন যোগই ছিল না। একটু পূর্বে উষ্ণ মস্তিষ্কে এই নারীটিই দৃঢ়তার সহিত ভাবিয়াছিল—যোগ ছিল—কিন্তু এখনি তাহার মন বলিতে চাহিল—না যোগ ছিল না!

সীতা নিজেই ভাবিল—সে-হয় কেমন করিয়া?

সময় যতই বাড়িয়া চলিতেছিল, পত্রপ্রাপ্তির আশা যখন ক্রমশই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, তখনই সেটাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইতেছিল।

কি মূঢ়তাই করিয়াছে সেই পত্রটায়! কলমের মুখে যে এতটা হলাহল ঢালিতে পারে—সে ত তখন বুঝিতে পারে নাই। যদি তিনি সেই অমার্জ্জনীয় পত্রটার শাস্তি তাহাকে দেন, তবেই দর্পিতা অভিমানিনীর উচিৎ শাস্তি হয়! ক্রমে যখন দিনের আলোক ম্লান-ধূসর হইয়া আসিল, তখন আর সে কোনমতেই বসিয়া থাকিতে পারিল না।

যতক্ষণ মানুষের একটা আশা—তেলশূন্য প্রদীপটার মত কোনরকমে মিট মিট করিয়াও জ্বলিতে থাকে, সলিতার তেলটুকু ফুরাইলে—অন্ধকার যেমন ক্ষীণ আলোটিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, সীতার বুকখানিও নিবিড় আঁধারে ভরিয়া গেল। আর কোন সম্ভাবনাই নাই।

কতবার কত লোক দ্বারে করাঘাত করিয়া ফিরয়া গেছে, সীতা উঠিতে পারে নাই, জননীর পুনঃ পুনঃ আহ্বানও নিরুত্তরে ফিরিয়া গিয়াছে—সীতা সাড়া দেয় নাই।

রাস্তার ধারের জানেলাটা খোলাই ছিল। কত গাড়ী ঘোড়ার শব্দ, কত লোকজনের কলরব উঠিতেছিল,—হঠাৎ সীতা বালিশ হইতে মাথা তুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল—ঐ বুঝি তিনি!

তখনি মনে পড়িল—না, না, না—তিনি নন্—তিনি মোটরে কেন আস্‌বেন। তাঁর যে গাড়ী। সে গাড়ীর ঘণ্টা-টা যে তার প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া আছে।

কিন্তু মোটর থামিল—একেবারে নীরব। সীতা বিস্রস্তবসনে উঠিয়া টলমল করিতে করিতে জানেলার লোহার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল। একবার ভাবিল—ঝুঁকিয়া দেখে! তখনি ভাবিল যদি দেখে অন্য বাড়ীর দ্বারে!—

দেখিতেই হইল, ইচ্ছা এত প্রবল—সীতা মুখটি বাড়াইয়া দেখিল। সঙ্গে সঙ্গেই দুইহাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িল।

এত বড় যে একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এবাড়ীর কেহই তাহা জানিত না। তত্ত্ব-র ব্যাপারটা কি-রকম কানঘুষা হইয়াছিল, কিন্তু বেশী-ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। কারণ, সীতাই পরে তজ্জন্য কত লজ্জিত হইয়াছিল, তাহা ত সকলেই বুঝিতে পারিল। আর সে ঘরের বাহির হইতে পারে নাই, লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে ঘৃণায় সে যে অনুতপ্ত হইয়াছে, ইহা রুদ্ধদ্বার কক্ষে কেহ তাহাকে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিল।

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়াই সীতা বক্ষের বসন ঠিক করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কম্পিত বক্ষে অর্গল খুলিয়া ঠিক দ্বারের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বার খুলিয়া গেল। যে-ঢুকিল, কোন কথা না বলিয়া সে একেবারেই সীতার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কম্পিত-মৃদু ও সংযত কণ্ঠে বলিল—সৃষ্টিছাড়া ডাক্তার আমি। চল সীতা, ও বাড়ী। আমি মোটর দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

সীতার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না।

কনক যেন তাহার দ্বিধা বুঝিয়াই বলিল—আরও কিছু জান্‌তে চাও, না-কি সীতা?

চাহে কি-না সীতা নিজেই জানে না—কি বলিবে! সেই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর স্বামী তাহাকে লইতে চাহিতেছেন—সে আরও কি শুনিবে!

কনক হাতটি ছাড়িয়া দিয়া, সীতার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়াই বলিল—যা ভেবেছি, তাই। একেবারে নদীনালা করে ফেলেছ-যে!

দুইহাতে কনকের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি বুকটির উপর রাখিয়া গদগদ-কণ্ঠে বলিল—কিছু শুন্‌তে চাইনে আমি!

কনক যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একটু একটু করিয়া বলসঞ্চয় করিয়া লইল, পরে বলিল—আমাকে তুমি মাপ করবে না, সীতা ?

তাহার আর্দ্র কণ্ঠস্বরে সীতা মুখ তুলিয়া চাহিল, একমুহূর্ত্ত পরে সজল নয়নে বলিল—তোমাকে মাপ করব আমি ! বল না অমন কথা। বরং বল—শত অপরাধেও যেন এ'দুটি চরণে আমাকে বঞ্চিত না হ'তে হয় ।—বলিয়া সীতা নত হইয়া কনকের পদস্পর্শ করিতে গেল।

কনক তাহার কটি বেষ্টন করিয়া তুলিয়া বলিল—কিছু দরকার নেই, সীতা—ওসবের কোন দরকার নেই।

একটু থামিয়া বলিল—তুমি তৈরী হ'য়ে নাও সীতা ! কি—চেয়ে রয়েছো যে ! বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? না, ভাবছ মা কি বল্‌বেন ? সে মীমাংসা আমি করে এসেছি সীতা। কোন আপত্যই মা করবেন না।

বলিয়াই সে সস্নেহে বলিল—তুমি তৈরী হ'য়ে নাও, লক্ষীটি আমার ! ও কি ! আবার মুখ নীচু করছ ?

সীতা মুখ তুলিল।

কনক বলিল—আমি মাকে বলে আসি।—ফিরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে যেতে দিনক্ষণ দেখবার দরকার নেই ত !—বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সীতা উঠিল না—মুহ্যমানভাবে বসিয়া রহিল। কনকের আজ্ঞা পালন করিতে পারিলে সে-যে সুখীই হইত, সে সন্দেহ তাহার মনেও ছিল না। কিন্তু সে ভাবিতেছিল সে কোথায় যাইবে ? স্বামী-গৃহে ! সে গৃহে আর তাহার আছে কি ?

হায় রে অবোধ মন ! এখনি যে গৃহের স্মৃতিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিতে-

ছিল, তাহারই আহ্বানে আবার বিরোধ করিয়া বসিস কেন? যাহার একচ্ছত্র লিপির আশায় সারা দিনমান মরিতে চাহিতেছিলি, তাহাকে অতি নিকটে পাইয়া আবার সঙ্কুচিত হস্ কেন?

একমুহূর্তে সীতার মনে কবেকার কোন্ অতীতকালের একটা কাহিনী একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। সেই সঙ্গেই তাহার রক্তাক্ত নারীহৃদয়টা যেন ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল! আজ সে কনককে মুখ দেখাইল কি করিয়া? একদিন যে অন্যানুরক্ত পুরুষের সঙ্গেই সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছিল—তাহারই ক্ষোভে লজ্জায় সে আরক্ত হইয়া উঠিল!

না—সে যাইবে না।

কনক অন্ধকারে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—সীতা!

সীতা সাড়া দিল না। দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া দেওয়ালের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কনক তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল; বিস্মিতকণ্ঠে বলিল—আলো জ্বেলে দাও, সীতা। আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

তথাপি সীতা নড়িতে পারিল না। দ্বারের পার্শ্বেই দেওয়ালে সুইচ আছে এটাও জানাইতে পারিল না!

কনক অগ্রসর হইয়া অন্ধকারের মধ্যেই সীতাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—আলো—

সীতা বলিল—দরজার পাশে।

কনক সুইচ-টি টিপিয়া দিতেই ঘর ভরিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে

দেখিল—সীতা তেমনি আলুথালুবেশে জানেলায় মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কনক আস্তে আস্তে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—এ কি! এখনও তুমি এমনি করে দাঁড়িয়ে আছ?

সীতা কথা কহিল না। হাত দুটিতে লোহার গরাদে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কনক বলিল—যাবে না—সীতা?

সীতা যেমন ছিল, তেমনি রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল।

কনক এক মিনিট পরে পুনরায় জিজ্ঞাসিল—কি বল, যাবে না—তুমি?

সীতার অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—কেবল একটি 'না' শুনিতে পাওয়া গেল।

সীতা! তুমি কি সেই-সীতা?—বলিয়া কনক ব্যাকুলভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। আর একটা কথাও কনকের মুখে জোগাইল না।

সীতা কিছুই বলিল না, একবার মাত্র সেদিকে চাহিয়া, তখনই মুখ ফিরাইয়া লইল!

কিছুক্ষণ কেহই কথা কহিল না। একজন জানেলায় মুখ রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে কি যে দেখিতেছিল সে-ই জানে—আর একজন দেখিতেছিল —তাহাকে! তাহারই সীতাকে, সহধর্ম্মিণীকে! তাহার সুগঠিত কিশোর অঙ্গ বায়ুতাড়িত বৃক্ষশিরের মত কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কনক পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সীতা যে তাহার বুকের হাহাকার গোপন করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে তাহা জানিত না, সে নিরতিশয় দুঃখে কষ্টে সীতার কঠিন হৃদয়ের কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মুখের কোন অংশই সে দেখিতে পাইতেছিল না—কেবলমাত্র কানের দুলন্ত দুল-দু'টি, আলোক

পড়িয়াছিল—ঠিক সেই দু'টির পরেই। সে দু'টিতে দু'খানি হীরকখণ্ড বসান ছিল—কনকের মনে হইতেছিল—সে ত হীরকপ্রভা নয়, এর যে দাহিকাশক্তি আছে—যেন তাহাকেই পুড়াইতে ঐ দুইটি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিতেছে।

সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—সীতা—তা হ'লে......

সীতা ফিরিয়া চাহিল, কি-যেন বলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, আবার কি ভাবিয়া জানেলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

কনক দু'পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—সীতা, যদি বুঝতে পারতে—আগুণটা আমাকেও কি-রকম দগ্ধ করছে—আর কিছু না হোক—অন্ততঃ একটা কথাও বল্‌তে!—তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

পরক্ষণেই সে দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিল—শাস্তি দিচ্ছ কা'কে সীতা? যে মরে গেছে—তা'কে। সে-ত নিজেই পুড়ে মরেছে—আবার কেন? একটু থামিয়া আবার বলিল—দেখ-দেখি সীতা—আমাকে.........

সীতা ফিরিল। এ কি মূর্ত্তি! এতক্ষণ সে ত দেখে নাই! এ যে একেবারে কালী হইয়া গিয়াছে! প্রচণ্ড বিস্ময়াবেগে মানুষ যেমন কোন কিছুই বুঝিতে পারে না, সীতাও তেমনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। কি-সে এমন হইয়াছে, কেন এমন হইয়াছে, কোনটাই তাহার মাথায় আসিল না।

কনক আস্তে আস্তে বলিল—তবু তোমার দয়া হ'ল না, সীতা? না—না, ও-কি!—বলিতে বলিতে সে সীতাকে ধরিয়া ফেলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—কেঁদ না, সীতা।

কখনই সে বেশী কথা কহিতে পারিত না, সে অভাবটা এত

করিয়া কোনদিন অনুভব করে নাই, আজ যেমন করিল। আজ তাহার মনে হইতেছিল—যদি সে তাহার হৃদয়টাও সীতাকে দেখাইতে পারিত।

সীতা তাহারই বুকের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতেছিল। এক হাতে তাহার কটি বেষ্টন করিয়া অন্য হাতে সীতার মুখখানি তুলিতে তুলিতে বলিল—যাকে কয়লা ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছ, কয়লা আর নেই সে, সীতা, আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। সীতা এখন তুমি নিঃশঙ্কমনে তা'কে তুলে নিতে পার—কোনদিন আর সে হাত কালো হবে না।—আমার কথা বিশ্বাস কর—সীতা।

সীতার বক্ষ বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আন্দোলিত হইয়া উঠিল—সে মুখ তুলিতে গেল, পারিল না—কনকের জামারই কতকাংশ দাঁতে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সীতা কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কনক এ-ঘরে ঢুকিয়া প্রথম আলোকপাতে যখন তাহার পাংশু কৃশ মলিন মূর্ত্তি দেখিল, তাহার হৃদয়ের ভিতরটায় যেন আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। যে-কথা সে অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের নিভৃত দেশে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহারাই সীতার পীড়িত মুখখানি, মলিন চোখ দুটির আভাষ পাইতেই হুড় হুড় করিয়া বাহিরিয়া আসিল।

কনক দুই হাতে একটু জোর করিয়াই মুখটি তুলিয়া ধরিল—কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সীতা খাটে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কনক স্তম্ভিত হইয়া গেল। অন্যায় যে কতদূর হইয়াছিল—সে ত জানে! কিন্তু এ কি! এর আভাষ ত কোনদিনই সে পায় নাই। আজ সীতাকে দেখিয়া সে ভাবিল—ওঃ কি সর্ব্বনাশই করিতে বসিয়াছিল।

এক মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় ত সে জাহ্নবীকে এমনি করিয়া কোথায় টানিয়া ফেলিত!.. সে কঠিন পুরুষ—সে যাহা দমন করিতে পারে নাই—জাহ্নবী তাহা পারিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল—জাহ্নবী যেন অকূল সমুদ্রে কুল পাইয়াছে। আর সে?

সীতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চুপ করিল,—উঠিল না। মাটিতে দাঁড়াইয়াই সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

কনক ভাবিল—তবে কি তাহার আশ্রয় নাই? সে একেবারেই নিরাশ্রয়! কোথাও তার এতটুকু স্থান মিলিবে না? ঐ যে নারীটি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়ছে—সে কি এত পাপ করিয়া আসিয়াছে—যে তাহার কাছেও আশ্রয় পাইবে না? তবে সে কোথায় যাইবে!

বাহিরে কি একটা শব্দ হইয়াছে, কনক চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখিল—সীতা উঠিয়া আবার জানেলার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কনক তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—পারবে না, সীতা!—গম্ভীর শব্দে সীতা চোখ্ তুলিতেই কনকের অশ্রুসিক্ত মুখ দেখিতে পাইল।

এক নিমিষে সীতার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গেল, কম্পিত-দৃঢ়-হস্তে গরাদে চাপিয়া ধরিল।

কনক জিজ্ঞাসিল—পারবে না?

সীতা নতমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল—পারব।

উপসংহার।

উমাসুন্দরী সীতার পুত্রটিকে চুম্বন করিতে করিতে পার্শ্বোপবিষ্টা সীতার নত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—যা মা যা, আর দেরী করিস্ নে—চুল টুল বেঁধে নে। তিনটে বাজল প্রায়, এখনি সব এসে পড়বে।

একমাস পরে সীতা আজই সূতিকাগৃহ ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে—মুখখানি বিষণ্ণ। কনকের বন্ধুবান্ধব, সীতার বাল্যসখী এবং পিত্রালয়ের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, প্রভাতে উমাসুন্দরী সকলকে লইয়া কালীঘাটে পূজা দিয়া আসিয়াছেন। সীতার পরিধানে তখনও সেই পট্ট বস্ত্রখানি, কপালে শুষ্ক চন্দনের অস্পষ্টরেখা এখনও অভ্রান্তরূপেই রহিয়াছে।

কনক বাহিরে গিয়াছে—কয়েকটা কাজ বাকী আছে। এখনি আসিবে বলিয়া গিয়াছে। উমাসুন্দরী তাহার কোলে ছেলেটিকে দিতে গিয়াছিলেন, সে হাসিয়া পুত্রের গালটি টিপিয়া ধরিয়াছিল। লজ্জারক্ত হাসিমুখে সীতার পানে চাহিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

নারী-জীবনে এত বড় সৌভাগ্য-পরিচয় আছে কি না আমরা জানি না—কিন্তু এ পুলকের আস্বাদেও সে-যেন তৃপ্ত হইতে পারতেছিল না।

কথাটা যে উমাসুন্দরী না বুঝিয়াছিলেন, তা'ও না এবং যে প্রসঙ্গ—একেবারেই চুকিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, না বাস্তবে না স্বপ্নে তাহার আর অস্তিত্ব নাই জানিয়াও কথাটা তিনিও ভুলিতে পারিতেছিলেন না।

শিশু মাতার পানে পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতেছিল, উমাসুন্দরী বলিলেন-দেখ বৌ-মা দেখ, মা দেখছে—দেখ।

সীতা ম্লানমুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া চাহিল; সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ঐ রক্ত-মাংসপিণ্ডটিকে কোলে তুলিয়া লইতে যে আগ্রহ জাগিতেছিল—তাহা দমন করিয়া ফেলিল।

উমাসুন্দরী বলিলেন—যাও মা, আর দেরী কর না।

মামী!—বলিয়া জাহ্নবী ঘরে ঢুকিতেই উমাসুন্দরীর বক্ষে কি-যে ব্যথা বাজিয়া উঠিল—প্রথমেই তিনি তাহাকে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কিন্তু অভ্যর্থনা না করাও যে কতবড় অন্যায় তাহাও বুঝিতেছিলেন।

জাহ্নবী একেবারে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বলিল—মুখখানি বসান সীতার, না মামী?

হ্যাঁ—বলিয়া উমাসুন্দরী সীতাকে বলিলেন—ভালই হ'য়েছে—জাহ্নবী এসেছে। দে ত মা, ওর চুলটা বেঁধে।

জাহ্নবী সীতার পার্শ্বে বসিতেই সীতা বলিল—চল, ঘরে যাই।

জাহ্নবী খোকাকে কোলে করিয়া সীতার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে বক্ষের বসন হইতে একছড়া হীরক হার বাহির করিয়া খোকার গলায় পরাইতে পরাইতে বলিল—পরিয়ে দিই বৌ?

সীতা বলিল—কেন দেবে না ভাই?

আজও সমস্তদিন যখন জাহ্নবী আসিল না—তখন সীতা যেন দুঃখের ভারে নত হইয়া পড়িতেছিল। সে যে জাহ্নবীকে ক্ষমা করিয়াছে এবং নিজের হৃদয় দ্বন্দ্বের সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে বিন্দুমাত্র অপরাধী করিয়া বসিয়া নাই—জাহ্নবী যদি না আসে, সে তাহাকে জানাইবে কেমন করিয়া? সমস্তদিনই তাহার ভাবনা ছিল—হয়ত সে আসিবে না!

এখন সে আসিয়াছে, তাহার পুত্রটিকে কোলে লইয়া চুম্বনে গণ্ড ভরিয়া

দিয়াছে, কিন্তু যে অভিমান তাহার কণ্ঠমধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল, তাহা সে প্রকাশ করিতে পারিল না। শুধু দু'টি হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কি বলেছিলে, ঠাকুরঝি, মনে আছে?

জাহ্নবী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিল, কি ভাই?

আমার খোকাকে তুমি রোজ নিয়ে যাবে……

ওঃ—মনে আছে?

নেই! বা রে! আরও একটা কথা মনে আছে।

জাহ্নবী সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া লইল। সীতা প্রসন্নহাস্যের সহিত বলিল—তুমিই কেবল বলেছিলে, খোকা হ'বে। আমি ত ভেবেছিলুম……

এই সময়ে উমাসুন্দরী বাহির হইতেই বলিলেন—শীঘ্র তোরা নে মা। বেলা গেল।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল—হ'ল বৌ?

সীতাও হাসিল, বলিল—বেশ লোক যা হ'ক। তুমিই ত দেবে বেঁধে।

উমাসুন্দরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—ও মা! আমি বলি এতক্ষণ হ'য়ে গেছে বা! দু'টিতে মুখোমুখী করে গল্প হ'চ্ছে! আর তুই কি করছিস্—পিটির পিটির—বলিয়া খোকার গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন।

জাহ্নবী বলিল—তোমার হাতে কি মামী?

উমাসুন্দরী কাগজটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—একটি উচ্ছ্বাস, লিখেছি, জাহ্নবী!

একটু থামিয়া বলিলেন—তোরা অবাক হ'য়ে গেলি যে আর লিখ্‌ব না বলেছিলুম। এ আনন্দ কি আমার রাখবার স্থান আছে মা? আমার কনকের ছেলে……

নিম্নতল হইতে কনক বলিয়া উঠিল—মা, মাণিকবাবু যে এখানে একেলা বসে।

উমাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—জামাই এসেছেন—কৈ—তুই ত কিছু বল্লি নে, বাছা।—তিনি সসব্যস্তে প্রস্থান করিলেন।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিল—নাও, বস।

সীতা বলিতেছিল—খোকাকে নিয়ে……

জাহ্নবী বলিল—সে ভাবনা ত তোমার নয়, বস।

শেষ।